২০০১

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ১৭তম সংখ্যা

১৫ মার্চ, ২০০১ ইসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

ঐতিহাসিক মার্চ মাস

মার্চ মাস আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাবে লুদ তথা লুধিয়ানা শহরে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর হাতে ৪০ জন বয়াত করেন। ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে যে শপথ তাঁরা নিয়েছিলেন তারই সুফল আমরা দেখতে পাই বিশ্বের ১৭০টি রাষ্ট্রে আহমদীয়তের প্রতিষ্ঠার আকারে। বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তৌহীদের যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেই পতাকা আজ পত্ পত্ করে উড়ছে ১৭০টি দেশের হাজার হাজার জামাতে। অথচ আহমদীয়তকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেবার জন্যে উগ্র মৌলবাদী চক্র দৃঢ় শপথ নিয়ে একদিন মাঠে নেমেছিল, কিন্তু যিনি এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই খোদাও দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর প্রিয় এ জামাতকে রক্ষা করার জন্যে। আহমদীয়তকে এ ধরা ধাম থেকে কেউ মিটাতে সক্ষম হয় নি আর ইন্শাআল্লাহ্ হবেও না। কেননা, এর মালিক একে তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রক্ষা করে চলেছেন এবং চলবেন। যারা এখনও আহমদীয়তকে মিটাবার জন্যে অপচেষ্টায় লিপ্ত তাদের জন্যে দুঃখ হয় যে, কেন তাদের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন ঘটে না! আল্লাহ্র সাথে পাল্লা দিয়ে কেউ কখনও সফলতা লাভ করতে পেরেছে কি? এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার যে ব্যর্থতার টিকা অপশক্তির কপালে পরেছে আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং যারা আহমদীয়তের বিরোধিতা করছেন আমরা তাদের জন্যে আজকের দিনে আন্তরিকভাবে দোয়া করছি যেন আল্লাহ্তাআলা তাদের হৃদয়কে প্রসারিত করে দেন এবং সত্যকে গ্রহণ করার তৌফীক দেন। তারা আল্লাহ্র সাথে পাল্লা দেয়ার ধৃষ্টতা যেন আর না দেখান।

মার্চ মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতারও মাস। এক বিরাট ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে বাঙালী জাতি দেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে এনেছিলো। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। এ দিবস উপলক্ষ্যেও আমি সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। যে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত, সেই নীতিকে নিশ্চিহ্ন ও পদদলিত করার জন্যে অপশক্তিসমূহ হিংস্র থাবা বিস্তার করছে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ্তাআলা আমাদের প্রিয় দেশের স্বাধীনতাকে যেন চির অক্ষুণ্ন ও বিপদমুক্ত রাখেন। কোন অপশক্তি যেন দেশের স্বাধীনতাকে হুমকীর মুখে ঠেলে দিতে না পারে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ১৭তম সংখ্যা

১ চৈত্র ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ১৮ যিলহাজ্জ ১৪২১ হিঃ কাঃ
১৫ আমান ১৩৮০ হিঃ শাঃ ১৫ মার্চ ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের পুনরাবর্তন

বর্তমানে আমরা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছি এ সময়টি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের মহান যুগের ঘটনাবলীর পুনরাবর্তনের যুগ। ইংরেজীতে একটি কথা আছে History repeats itself - ইতিহাস নিজে নিজে পুনরাবৃত্ত হয়। কথাটা ধর্মীয় জগতে এভাবে ঘটে থাকে যে, আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং ঐশী ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে থাকেন বারে বারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ১৯৯৪ সনের ১১ই মার্চের খুতবার অংশ বিশেষ স্মর্তব্য ঃ

"আমরাই সেই 'আখারীন'-এর পর্যায়ে জন্মগ্রহণকারী যারা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর কল্যাণ লাভকারী। আমাদেরকেই 'আখারীন' হওয়া সত্ত্বেও 'আওওয়ালীন' (প্রাথমিক যুগের মুসলমান)-দের সাথে মিলিত করা হয়েছিল। আর আমরা ঐ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে শতবর্ষ পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐযুগে সৃষ্টি করা হয়েছে যখন মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত করা হচ্ছে। ঐসব কল্যাণই আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে দান ক'রে যাচ্ছেন।

আমি আমার খেলাফতে আসীন হওয়ার পর প্রথম ভাষণে জামাতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেছিলাম। স্মরণ রেখো, ইহা অসাধারণ দিন যাতে আমারা প্রবেশ করতে যাচ্ছি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)- এর নিকট প্রথম মা'মুরিয়ত (প্রত্যাদিষ্ট)-এর ইলহাম হয়েছিল। আর ১৯৮২ সনেই আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ খেলাফতের পরে ঐ সারাটা ইতিহাস বিরাশি (১৮৮২) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হতে যাচ্ছে এবং পুনরাবৃত্ত করা হবে। ঐসব কল্যাণরাশি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা দান করতে আরম্ভ করেছিলেন তা এ পর্যায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। সবাই এর অংশীদার। আমি নই। আপনারা সবাই, ঐ গোটা জামাত যাকে আল্লাহ্‌তাআলা সূচনা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবার জন্যে এসব কল্যাণ প্রত্যক্ষ করার জন্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন, আমাদের মধ্যে কতজন কত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবেন! কিন্তু দোয়া আমাদের ইহাই হওয়া উচিত যে, আমাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যেন এমন হয় যারা বিরাশি (১৯৮২) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কমপক্ষে ২০০৮ পর্যন্ত জীবিত থেকে আল্লাহ্‌তাআলার আশিষসমূহের (প্রত্যক্ষকারী) সাক্ষীতে পরিণত হয়। আর ইহা সেই কল্যাণমন্ডিত মহান যুগ যার মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি, উহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কীভাবে হতে পারে, অসম্ভব! ইহা ঐ যাদু যে সম্বন্ধে আমি বলছি। আমরা ঐ নেশায় চলছি। আর ইহাই ঐ যাদু যা সত্যে পরিণত হয়ে বিশ্বের নিয়তিকে পাল্টে দেবে। আপনাদের ওপরে ঐ নেশা প্রভাব বিস্তার করছে। তাই স্মরণ রাখুন, আবার এতদ্দ্বারা বিশ্বে পরিবর্তনসমূহ সাধিত হবে। এ প্রেরণা নিয়ে আপনারা উন্নতির এ পথে আগে আগে চলতে থাকুন। শত্রুরা দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছে। দিতে থাকুক। আশিসসমূহের পথ রুদ্ধ করতে পারে না। রুদ্ধ করতে পারে না। রুদ্ধ করতে পারবে না। যা চায় তা করে নিক। কিন্তু আপনারা বিশ্বস্ততার সাথে এ পথে পদক্ষেপ রাখুন, এথেকে সটকে পড়বেন না।

আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি দিন আমাদেরই জন্যে, আর কল্যাণরাশি নিয়ে আসবে। ভবিষ্যত সপ্তাহসমূহ আমাদের জন্যে, আর কল্যাণরাশি নিয়ে আগমন করবে। ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি মাস আমাদের জন্যে, আর আকাশ কল্যাণরাশি উজার করে দেবে। ভবিষ্যতের প্রত্যেক বছর কল্যাণরাশির সাথে আমাদেরকে স্বাগত জানাবে। বিগত প্রত্যেকটি বছর আমাদের জন্যে কল্যাণরাশি রেখে যাবে। ইহা মহান যুগ-পর্যায় যার মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি। অতএব খোদার কৃতজ্ঞতার গীত গাইতে গাইতে তাঁর প্রশংসা ও বন্দনা করতে করতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর ওপরে দুরূদ পাঠ করতে করতে সম্মুখ থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে চলে যাও। এমন কেউ নেই, যে তোমাদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করতে পারে (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ২৯-১২-২০০০ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)।

হযরত খলীফাতুল রাবে' (আইঃ)-এর উপরোক্ত মহান দিক-দিশারী কল্যাণ ও আশিসের প্রতিশ্রুতিশীল মূল্যবান বক্তব্য আমাদেরকে খুবই আশান্বিত ও অনুপ্রাণিত করে। একদিকে আমাদের যেমন ২০০৮ সন পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করা উচিত যেন আমরা স্বচক্ষে ঐসব কল্যাণ ও আশিসসমূহ দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি এ কল্যাণ ও আশিসসমূহের আগমনকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্যে আমরা যেন নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী দোয়ার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখি- আল্লাহ্ করুন তা-ই যেন হয়।

তেইশে মার্চ ও স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

আগামী ২৩শে মার্চ আহমদী জামাতের মহান প্রতিষ্ঠা দিবস ও ২৬শে মার্চ আমাদের দেশের মহান ৩০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং লেখক-লেখিকাগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল জুমু'আ-৬২	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত'	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা- মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
❑ অমৃত বাণী ঃ মুত্তাকীর পরিচয় হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ -জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪ ও ৮
❑ জুমুআর খুতবা ঃ পাকিস্তানে মৌলভীদের আসল চিত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
❑ ৭৭তম সালানা জলসায় ন্যাশনাল আমীরের উদ্বোধনী ভাষণ	ঃ আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী	৯-১০
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১১-১২
❑ যীশু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমন	ঃ জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ	১৩-১৮
❑ সময়ের কি অপব্যয় ব্যক্তিত্বের কি পরিচয়	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৯
❑ কবিতা ঃ আবার আসিব যবে	ঃ জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (বাবুল)	১৯
❑ আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা সংকলক - মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্, ওকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২০-২২
❑ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ও দাওয়াত ইলাল্লাহ্	ঃ জনাব কাওসার আলী মোল্লা	২৩-২৪
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫-২৭
❑ সহস্রাব্দের নব সিঞ্চনে জলসা সালানা - ২০০১	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবীব (জয়)	২৮
❑ হোমিও প্যাথিক – সদৃশ্য বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)	ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	২৯-৩০
❑ যুগের চাহিদা	ঃ আলহাজ্জ মোশারফ হোসেন মোল্লা	৩১-৩২

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন-এর ২০তম সালানা জলসার চিত্র।

কালামুল ইমাম

"হাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতাআলার তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর এই সকল আশিস ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয় নি বরং আসমানে এক পবিত্র সত্তা আছেন যার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে অর্থাৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের। তাঁর উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ন রেখে এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রসূলও হয়েছি অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি, এবং খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ লাভকারীও হয়েছি। এবং এর দরুন খাতামান্নাবীঈনের মোহরও অক্ষুণ্ন রয়েছে। কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিতরূপে প্রেমের আয়নার মধ্য দিয়ে ঐ নাম লাভ করেছি"(এক গলতি কা ইজালা)।

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত না হ'তাম, এবং তাঁর গোলাম ও অনুসারী না হ'তাম, অথচ আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পবর্তের সমানও হ'তো, তথাপি আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ কিংবা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হ'তে পারতাম না। কেননা, **এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া বাকী তামাম নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারে না**। কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রসূলে করীম (সঃ)-এর অনুসারী হন। এভাবে আমি একই সঙ্গে একজন উম্মতিও, একজন নবীও। আমার নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়তের প্রতিবিম্ব। তাঁর (সঃ) নবুওয়ত বাদ দিয়ে আমার নবুওয়তের কোনও অস্তিত্ব নেই। ইহা তো সেই মুহাম্মদী নবুওয়তই যা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে" (তাজাল্লিয়াতে ইলহিয়া)।

মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় এ জামাতগুলো যথারীতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মহান মুসলেহ মাওউদ দিবসের কার্যক্রম পালন করেছে ঃঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ জামাত। এখনো খবর আসছে।

– আহমদী বার্তা

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল জুমু'আ-৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২। যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্‌রই তসবীহ (পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা) করছে যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।[৩০৪৩]

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ③

৩। তিনিই উম্মীদের [৩০৪৪] মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত [৩০৪৫] শিক্ষা দেয়, যদিও ইতঃপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল;

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪। আর (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদেরই মধ্য থেকে অন্যদের মাঝেও যারা এখনও পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি। [৩০৪৬] এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⑤

৫। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা তাকে দেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

৩০৪৩। আল্লাহ্‌তাআলার চারটি গুণের উল্লেখের সাথে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত মহানবী(সঃ)-এর চারটি কর্মের উল্লেখ গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৩০৪৪। ৩ঃ১৫ এবং ৭ঃ১৫৮ দেখুন।

৩০৪৫। মহানবী (সঃ)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত ঐশী গুরুদায়িত্বের মধ্যে এই আয়াতটিতে চারটি পবিত্র কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এ হচ্ছে সেই মহান দায়িত্ব ও সেই সুমহান কর্তব্য যা সম্পাদন করার জন্য হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই এক অসামান্য গুণসম্পন্ন মহানবীকে আরবদের মধ্যে প্রেরণের প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সহযোগে সেই সুদূর অতীতে যখন কা'বা শরীফের ভিত্তি উঁচু করে গড়ছিলেন, তখনই তিনি এই সুদূর-প্রসারী দোয়াও আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করেছিলেন (২ঃ১৩০)। প্রকৃত কথা, কোন সংস্কারকই নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারেন না, যদি না তিনি স্বকীয় পূত-পুণ্য দৃষ্টান্ত ও পবিত্র উদাহরণ দ্বারা এমন এক সরল, ভক্ত, ধার্মিক ও প্রাণোৎসর্গকারী সম্প্রদায় বা জামাত সৃষ্টি করে যান যারা তাঁর আদর্শ ও নীতির ছাঁচে গড়ে উঠে এবং তাঁর বাণীর মর্মকথা, দর্শন, তাৎপর্য, যুক্তি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সকলের কাছে তা প্রচার করার মত আগ্রহ, যোগ্যতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে। সংস্কারক তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শিক্ষা দান করে থাকেন যে, অনুসারীদের বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ ও পবিত্র হয়ে উঠে; তাদের ধর্ম- বিশ্বাস সঠিক, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হয়। তাঁর পবিত্রতম দৃষ্টান্ত ভক্তদের হৃদয়ের সকল পঙ্কিলতাকে দূরীভূত করে পবিত্রতাকে শতগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। ধর্মের এই মৌলিক বিষয়গুলি এই আয়াতটিতে বিবৃত হয়েছে।

৩০৪৬। হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর আনীত ধর্ম কেবল আরবদের জন্যই নয় বরং তা আরব-অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানবের জন্যই আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম যে কেবল মহানবী (সঃ)-এর সমসাময়িক বিশ্ববাসীর জন্য তা-ই নয় বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ইহাই চূড়ান্ত ধর্ম হিসাবে বিরাজিত থাকবে। অথবা, এই আয়াতটির তাৎপর্য এ-ও হতে পারে যে, মহানবী (সঃ) অন্য আর একদল লোকের মধ্যে আবির্ভূত হবেন, তাঁরা সমসাময়িক অনুসারীদের অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হয় নি। এই আয়াতে, শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌রূপে মহানবী (সঃ)-এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সঃ) স্বয়ং এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। বিষয়টির উপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, 'একদা যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হলো। আমি রসূলে আকরম (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলাম, যারা এই সূরাতে উল্লেখিত 'তাদেরই মধ্য থেকে অন্যদের মাঝেও যারা এখনও পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি' সেই অন্যরা কারা? সাল্‌মান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এই একই প্রশ্ন করায় রসুলুল্লাহ্ (সঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায়, তথাপি, এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চিত তা ফিরিয়ে আনবে' (বুখারী ঃ কিতাবুত্ তফসীর)।

মহানবীর এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে ব্যক্তির আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি পারস্য বংশীয় হবেন। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ পারস্য বংশীয় ছিলেন। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর অনান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তখনই আগমন করবেন যখন 'কুরআনের অক্ষর ব্যতীত কিছুই বাকী থাকবে না এবং ইসলাম কেবল নামে মাত্র বাকী থাকবে' অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে (বায়হাকী)। অতএব, দেখা যায়, কুরআন এবং হাদীস উভয়েই এই একই কথা ব্যক্ত করেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের সত্তার মধ্যেই মহানবী (সঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে।

হাদীস শরীফ

হাদীস ঃ

খিলাফত 'আলা মিনহাজিন নবুওয়ত

"আন হুযায়াতা ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা তাকূনান্না - বুওওয়াতু ফীকুম মাশাআল্লাহু আন তাকূনা সুম্মা ইয়ারফা'উহাল্লাহু তা'আলা সুম্মা তাকূনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওওয়াতে মাশাআল্লাহু আন তাকূনা সুম্মা ইয়ারফা'উহাল্লাহু তা'আলা সুম্মা তাকূন মুলকান আয্‌যান ফাতাকূনু মাশাআল্লাহু আন তাকূনা সুম্মা ইয়ারফা'উহাল্লাহু তা'আলা সুম্মা তাকূনু মুলকান জাবারিয়্যাতান ফাইয়াকূনু মাশাআল্লাহু আন তাকূনা সুম্মা ইয়ারফা'উহাল্লাহু তা'আলা সুম্মা তাকূনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওওয়াতি সুম্মা সাকাতা।"

অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন; অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নেবেন। এর পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন, তখন অত্যাচার নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। উহা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন উহা জবরদস্তি মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত

আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সঃ) নীরব হয়ে গেলেন। (আহমদ, বায়হাকী, মুসনাদ আহমদের বরাতে মিশকাত, ২য় খন্ড, বাবুল ইন্‌যার ওয়াত্তাহ্‌যীর, পৃঃ ৪৬১)

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গে তাঁর একটি অঙ্গীকারের কথা এভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন (সূরাতুন্ নূর)। এ অঙ্গীকারটি অর্থাৎ খিলাফত হলো মু'মিনদের জন্য একটি সনদ।

আঁ হুযূর (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন এর মাধ্যমে খোদা-তাআলা তাঁর এই অঙ্গীকার-কে পূর্ণ করেছেন। পরবর্তীতে আমরা ঐ যুগকে পেয়েছি যার ভবিষ্যদ্বাণী হুযূর (সঃ) করে গেছেন যে, খিলাফতের পর অত্যাচার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর আমরা **সুম্মা তাকূনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওওয়াত** অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফতের যুগ দেখবো। হুযূর (সঃ) বলেছেন, চরম অধপতনের সময় নবুওয়তের পদ্ধতির খেলাফত তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার ঘোর বিপর্যয় হতে রক্ষা করবে।

খোদা ও তাঁর রসূলের অমৃতবাণী অনুযায়ী ১৮৩৫ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ সনে তিনি দাবী করেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) করেছেন। ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানাতে সূফী আহমদ জান সাহেবের বাসায় ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে বয়ত নেন। খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর বাণী পূর্ণ হলো। কিন্তু পরিতাপ! দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে চায় নি তবে খোদা তাকে গ্রহণ করেছেন। বাতিল ধর্ম ও পথভ্রষ্ট মানবজাতি পূর্ণশক্তি দ্বারা তাঁকে মিটিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগলো কিন্তু খোদা তাঁকে জানালেন, **আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।** আরো জানালেন তোমার ও তোমার সিলসিলা দ্বারা ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবো। দেখতে দেখতে শতাব্দী গত হয়ে গেল। খোদা ও তাঁর প্রেরিতের শত্রুরা লাঞ্ছিত হলো ও অসফল হলো। বড় বড় নিদর্শন দ্বারা তাঁর ও তাঁর সিলসিলার সত্যতা প্রকাশ পেল। এমনকি সূরা নূর ও উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী ১৯০৮ সনে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ অব্দি সেই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ খিলাফত মু'মিনগণের জন্য সনদ হয়ে আছে। নতুন শতাব্দীর প্রথম ২৩শে মার্চ আবার আমাদেরকে স্মরণ করাতে আসছে যে, হে মানবজাতি! এখনও কি তোমরা চোখ বন্ধ করে রাখবে, হে মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দুগণ! তোমাদের সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ কোথায় যার আগমনের প্রতীক্ষায় বিগত শতাব্দীর প্রতিটি দিন গুণে গুণে কাটিয়েছো? চোখ খুলে দেখুন অপরিচিত ব্যক্তি যাকে কেউ জানতো না ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ খোদার নির্দেশে বয়াত নেন যে, হে মানবজাতি! আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমিই সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি তোমরা আমার হাতে বয়াত কর। হে মানবজাতি! কুরআন ও তাঁর নবীয়ে খাতামান্নাবীঈন (সঃ)-এর ফরমান অনুযায়ী আজ তোমাদের মুক্তি এই প্রতিশ্রুত মহামানবের হাতে বয়াতের মধ্যে নিহিত। আজ বিশ্বের ১৭০ এর অধিক দেশে ৭.৫ কোটিরও অধিক পবিত্র আত্মা তাঁর হাতে বয়াত করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশকে মেনেছে। যারা এখনও তাঁকে গ্রহণ না করে নিজেদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের শুধু আল্লাহ্‌র রসূলের এই বাণীটুকুই শুনাবো, "যে ব্যক্তি যুগ-ইমামকে না মেনে মৃত্যু-বরণ করবে সে জাহেলিয়তের মৃত্যু বরণ করবে" (মুসনাদ আহমদ)।

আল্লাহ্ করুন উম্মতে মুসলেমা তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে তাঁর হাতে বয়াত করে উম্মতে ওয়াহেদাতে বা একই উম্মতে পরিণত হ'তে পারে, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মাওলানা সালেহ্ আহমদ,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সমন্বয় ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই খোদাতাআলার দেয় শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে

যতটুকু শক্তি সামর্থ্যই আল্লাহ্ দিয়েছেন তা নষ্ট করার জন্য দেয়া হয় নি। সমন্বয় ও সদ্ব্যবহারের ফলেই এগুলোর ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে। এ কারণেই ইসলাম যৌন-শক্তি ও চক্ষুকে নষ্ট করে ফেলার শিক্ষা দেয় নি বরং ওগুলোর সঠিক ব্যবহার ও আত্মার পবিত্রতা সাধন করানো হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন" "মু'মিনগণ নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে" (২৩ঃ২)। অনুরূপভাবে এখানেও বলেছেন, মুত্তাকীর জীবনের চিত্র অঙ্কণ করে শেষে পরিণাম সম্বন্ধে ইহা বলা হয়েছে- "এবং তারাই সফলকাম হয়েছে" (২ঃ৬) অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা তাকওয়ার পথে অগ্রসর হয়। অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, টলায়মান নামাযকে পুনরায় দাঁড় করায়, খোদার দেয়া থেকে দান করে, নিজের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও তা ভ্রুক্ষেপ না করে অতীত ও বর্তমান ঐশীগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরিণামে নিশ্চিত বিশ্বাসের সীমায় পৌঁছে যায়। তারাই হ'লো ঐ সকল লোক যারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা এরূপ এক পথের ওপর রয়েছে যা সরাসরি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যা অতিক্রম করে মানুষ সফলতার দ্বারে গিয়ে পৌঁছে। সুতরাং এইসব লোকই সফলকাম যারা নিজেদের গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছে যাবে। এবং ফলে বিপদ-সঙ্কুল পথ থেকে তারা বেঁচে গেছে। এ কারণে শুরুতেই আল্লাহ্‌তাআলা তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) শিক্ষা দিয়ে এরূপ এক গ্রন্থ আমাদেরকে দান করেছেন যার মধ্যে তাকওয়া সম্বন্ধে উপদেশবাণীও দেয়া হয়েছে।

দারিদ্র ও বিনয়ীর জীবন যাপন কর

সুতরাং আমাদেব জামাত সব রকমের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে অধিক এ দুঃখ নিজেদের প্রাণে সয়ে নেয় যে, তাদের মধ্যে তাকওয়া আছে কি নেই। তাকওয়াপরায়ণদের জন্য এই শর্ত রয়েছে, তারা দারিদ্র ও বিনয়ীদের জীবন যাপন করবে। এটা তাকওয়ার একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদেরকে ক্রোধ ও উত্তেজনার মোকাবেলা করতে হয়। বড় বড় জ্ঞানী ও

(অবশিষ্টাংশ ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাকিস্তানে মৌলভীদের আসল চিত্র

অর্থনীতির নিজস্ব একটি গতিপথ আছে। স্বৈরাচারীর আদেশে অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারিত হয় না। জেনারেল সাহেব ক্ষমতা দখলের পর থেকে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

পাকিস্তানে জেনারেল সাহেব আসার পর থেকে আহমদীদের উপর যুলুম অত্যাচারও বেড়ে গেছে।

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "একযুগ আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম, কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো থাকবে। মসজিদগুলো আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না।"

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৬ জানুয়ারী, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) সূরা মায়েদার ৬০-৬১নং আয়াত পাঠ করে খুতবা দেন ঃ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝

অনুবাদ ঃ অর্থাৎ "তুমি বলো, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা কি আমাদের ওপরে শুধু এ কারণে দোষারোপ করো যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র ওপর ও তার ওপর যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং উহার ওপর যা পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে? অথচ তোমাদের অধিকাংশ অবশ্যই দুষ্কৃতিপরায়ণ।"

তুমি বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক থেকে তা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিবো? যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন আর যার ওপর তিনি ক্রোধ বর্ষণ করেছেন এবং যাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর (সাব্যস্ত) করেছেন এবং যারা তাগুতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে এরাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও সোজা পথ থেকে সর্বাধিক ভ্রষ্ট।'

এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি হাদীস (বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের কাছ থেকে হঠাৎ করে ধর্মীয়-জ্ঞান কেড়ে নিবেন না। বরং আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে ধর্মীয়-জ্ঞান বিলুপ্ত হবে। যখন আলেম ব্যক্তিরা থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞ লোকদেরকে নেতা বানাবে এবং তাদের কাছে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জানতে চাইবে। তখন ঐ অজ্ঞ নেতারা তত্ত্ব-বিবর্জিত ফতোয়া প্রদান করবে এভাবে তারা নিজেরাও বিপথগামী হবে এবং অন্য মানুষকেও বিপথগামী করবে।"

অপর একটি হাদীস হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "মানুষের

উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের কেবলমাত্র নাম, কুরআনের কেবল মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়াতশূন্য হবে। তাদের আলেমরা আকাশের নীচে সকল সৃষ্ট-জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্যে থেকে ফেৎনা ফাসাদ উঠবে, এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।"

হযরত সালেবা বাহরানি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (উসদুল গাবা) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে জ্ঞান তুলে নেয়া হবে, এতদূর পর্যন্ত যে, তাদের কাছে ইল্‌ম ও হেদায়াত ও জ্ঞান-বুদ্ধির কোন কিছুই থাকবে না।"

সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! ইলম্ কীভাবে তুলে নেয়া হবে যখন আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থ আছে এবং আমরা আমাদের সন্তানদের কে তা শিখাব? উত্তরে আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, তাওরাত ও ইঞ্জিল ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে কি নেই? তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব তাদের কী উপকার করেছে?

সূরা মায়েদার যে আয়াত আমি প্রথমে তিলাওয়াত করেছি এবং যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করলাম তা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এমন আলেম যাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকতেন, তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অপরদিকে যারা বাকী আছেন তারা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব। কুরআন শরীফে যে বলা হয়েছে শূকর ও বানর -এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবিক অর্থেই তারা শূকর ও বানর হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার তো অদ্ভুত গল্প-কাহিনীও লিখেছেন যে, কোন এক গ্রামে তারা আবদ্ধ ছিল সকলেই শূকর ও বানর হয়ে গিয়েছিল ঐ যুগের মৌলভীরা। আসলে তফসীরকারগণ বুঝতে পারেন নি যে, শূকর ও বানর হয়ে যাওয়ার অর্থ কী? শূকর ফসল নষ্ট করে, আরো জঘন্য স্বভাব রয়েছে এদের। আর বানরের স্বভাব হচ্ছে অনুকরণ করা। যেমন ভাল তিলাওয়াত তো অনেকেই করে কিন্তু কুরআন শরীফের পবিত্র অর্থ আধ্যাত্মিক আলো তার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের জন্য বিশৃংখলা ও অস্থিরতার যুগ আসবে। মানুষ আলেমদের কাছে যাবে হেদায়াত পাবার আশা নিয়ে কিন্তু তারা আলেমদেরকে শূকর ও বানরের 'মত' পাবে।' এখানে আঁ হযরত (সঃ) 'মত' পাবে বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আলেমরা বাহ্যতঃ শূকর ও বানর হয়ে যাবে না। বরং শূকর ও বানরের মত স্বভাবের হয়ে যাবে। বানরের মত অনুকরণ তো করবে কিন্তু তাদের অন্তরে কুরআন প্রবেশ করবে না।

এ সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের শোনাতে চাই। 'তকদীর' নামের একটি পত্রিকা মিথ্যা প্রচারে প্রথম স্থানে আছে। সারগোধা জেলার তাখ্ত হাজারা গ্রামে কেন আহমদীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, ঘটনাটি আহমদীদের - অপকর্মের ফলেই ঘটেছে।

একটি বিশেষ ঘটনার কারণে অন্য কোনস্থানে এমন ঘটনা না ঘটে তাখ্ত হাজারায় কেন ঘটেছে তা-ও বর্ণনা করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে; "তাখ্ত হাজারা এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। (লক্ষ্য করুন, কি বলছে) কারণ সেখানে মির্যা তাহের আহমদের বিয়ে হয়েছে। (শ্রোতাবৃন্দ সবাই হেসে দিয়েছেন- অনুবাদক) তারপর হযরত সাহেব হেসে হেসে বলেন, এতে মানুষ হাসবে না কাঁদবে বলুন! বড়ই মুর্খ মৌলভী, আর বড়ই মিথ্যুক! এর বেশী আর কি বলা যায়। পাঞ্জাবী ভাষায় বলে, "জিন্নে মর্জি ঝুট বল্লো।" এদের অবস্থাও এমন যে, যতই মিথ্যা বলুক যথেষ্ট নয়।

পত্রিকার প্রতিবেদক লিখছেন- "গ্রামের প্রতিবাদী জনতা মিছিল বের করে। আতহার শাহ মিছিলের শিরোভাগে ছিল। মিছিল যখন একটি আহমদী বাড়ীর দালানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, কয়েকজন কাদিয়ানী সামনে এসে আতহার হোসেন শাহ্কে ধরে টেনে-হেঁচড়ে দালানের ভেতরে নিয়ে যায় এবং তার উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। মিছিলের সমস্ত মুসলমান কিছুই করতে পারে নি।"

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, এ মিছিল প্রকাশ্য দিবালোকে বড় উগ্র মূর্তি ধারণ করতঃ আহমদীদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে পুলিশের একটি বাহিনী সহকারে আহমদী মসজিদকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এ মিছিল থেকে কোন ব্যক্তিকে ধরে দালানের ভিতরে নেয়ার বর্ণনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আদৌ এমন কোন ঘটনা ঘটে নি। আর তার উপর অত্যাচার তো বড়ই হাস্যকর কথা। আরো লিখেছে, 'উক্ত আতহার শাহ্র জিহ্বা এবং কান অত্যাচারের সময় আহমদীরা কেটে ফেলেছে।' সম্পূর্ণ মিথ্যা খবর। আতহার শাহ্ তো সবার চোখের সামনে এখানে সেখানে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই দেখছে, তার জিহ্বা ও কান সম্পূর্ণ ঠিক আছে।

১৯৭৪ইং সনের রাবওয়ার ঘটনাকেও মৌলভীরা এ রকমভাবে মিথ্যা বর্ণনা করেছিল যেন, অ-আহমদীরা উত্তেজিত হয়ে আহমদীদের সাথে এমনই দুর্ব্যবহার করে। আল্লাহ্ যাকে নিরাপত্তা দেন তার ক্ষতি কেউ করতে পারে না। পাকিস্তানে এমন পরিবেশে আহমদীদেরকে আল্লাহ্ই রক্ষা করছেন। সাধারণতঃ আহমদীরা ভালই আছেন। কিন্তু মৌলভীরা কখনও কখনও সুযোগ পেলেই আহমদীদের উপরে অমানবিক নির্যাতন করছে। এত ভয়ানক নির্যাতন আহমদীদের উপরে বর্তমানে আর্মীর জেনারেল সাহেবের যুগে হচ্ছে যে, এতটা ইতঃপূর্বে কখনও হয় নি। জেনারেল সাহেব বলছেন এক রকম কাজ করছেন ভিন্ন রকম। তিনি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কথা বলে সেনাবাহিনী নিয়ে আসলেন আর অর্থনীতির সর্বনাশ করে তবে ছাড়লেন। অর্থনীতি কোন স্বৈরাচারের কথা মত চলে না। অর্থনীতির নিজস্ব ধারা আছে। যতক্ষণ অর্থনীতির ধারাকে ঠিকমত চলতে না দেয়া হবে ততক্ষণ জোরপূর্বক অর্থনীতিকে সঠিক করার চেষ্টা করা অর্থনীতিকে ধ্বংস করার নামান্তর।

আজ পাকিস্তানের অবস্থা তদ্রূপ। অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তান কখনও এত গরীব ছিল না যতটা গরীব আজ হয়ে পড়েছে। যে দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিবেশ নষ্ট করা হবে সে দেশে দরিদ্রতার পরিবেশই বিরাজ করবে।

অতএব স্মরণ রাখবেন, আমরা যখন দোয়া করতে বলি, **"আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকীন"** তখন আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্যই করি। যতদিন সেখানকার বড় বড় দুর্বৃত্ত ধৃত না হয় ততদিন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হতে থাকবে। ভবিষ্যতে আরো খারাপ হবে।

ফেৎনা ফাসাদ পরস্পর একে অপরকে গালি, একে অপরকে খুন, যুলুম - অত্যাচার, শিশু নারী নির্যাতন এত অত্যাচার- অনাচার হচ্ছে যে, আমি এর সব বিবরণ বলে শেষ করতে পারব না। আপনারা কখনও 'জং' পত্রিকা দেখেন তো কিছু কিছু বিবরণ সেখানে পাবেন।

আরো একটি মুখরোচক চটকদার কাহিনী শুনুনঃ (পূর্ব-প্রসঙ্গক্রমে) কিছু সম্মানিত ব্যক্তি কাদিয়ানীদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, কম পক্ষে আতহার শাহ্র লাশ-ই ফিরিয়ে দাও। অথচ বাস্তব এই যে, আতহার শাহ্ জীবিত আছে আর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার হাত, চোখ, কান সবই ঠিক আছে। মৌলভীরা কোথাও তাকে পুঁতে রাখে নি- তাখ্ত হাজারাতেও না, অন্য কোথাও না। সেতো তাখ্ত জাজারার অধিবাসীও না। তারা বলল- আমাদিগকে আতহার হোসেন শাহ্-এর লাশই দিয়ে দাও। আমরা চলে যাব। কিন্তু কাদিয়ানীরা অস্বীকার করেছিল। কাদিয়ানীরা অস্বীকার কেন করবে না। তাদের কাছে আসল ঘটনাঃ- ঘটনার দিন আতহার শাহ্ নিজ সমর্থকদের নিয়ে দল বেঁধে গ্রামে চক্কর দিচ্ছিল। আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করার মত স্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছিল। গালি ও জঘন্য অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করছিল। আহমদীরা নিজেদের গৃহের দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে ছিল। বিরোধীরা বার বার আহমদীদের বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ডাকছিল। এভাবে সারা দিন বিরোধীরা মহড়া দিতে থাকে এবং পরিবেশকে উত্তেজিত ও খারাপ করতে থাকে। সন্ধ্যার পর আরও বেশী যুবক একত্রিত করে আহমদীদের মসজিদকে ঘিরে ফেলে। আক্রমণকারীরা লাঠি ও কুড়াল হাতে নিয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে নামাযের সময় আহমদীরা খালি হাতে মসজিদে নামাযের জন্য গিয়েছিল। আতহার শাহ্ তার উত্তেজিত সঙ্গীদের নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে আহমদীদের উপর আক্রমণ শুরু করে। কয়েক জন আহমদী নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করতে থাকে। এ সময়ে আতহার শাহ্ আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধী পক্ষের মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা হ'তে আরম্ভ হয়ে যায় যে, কাদিয়ানীরা আতহার শাহ্কে খুন করে ফেলেছে। ঘোষণা শুনে সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক কুড়াল, লাঠি এবং আগ্নেয়াস্ত্রসহ আহমদীদের মসজিদে এসে আক্রমণ চালায়। সামান্য কয়েক জন আহমদী মসজিদে নামাযের জন্য উপস্থিত ছিল খালি হাতে। চারজন আহমদী ঘটনা স্থলেই শাহাদত বরণ করেন। আহত একজন পনের বছরের কিশোর হাসপাতালে গিয়ে মারা যায়। মসজিদে আহমদীদের প্রথমে মারপিট করে, পরে ঘাড়ে কুড়াল মেরে শহীদ করে। তারপর তাদের মুখমন্ডলকেও কুড়াল মেরে মেরে বিকৃত করে দেয়। এরপরও ঐসব নরপশুদের তৃপ্তি হয় নি। ঐ পাঁচজনের মধ্যে একজন দৌড়ে মসজিদের ছাদের উপর গিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ছাদের উপর গিয়ে তাকেও হত্যা করে এবং তার লাশকে ছাদের উপর থেকে টেনে-হেঁচড়ে নীচে রাস্তায় ফেলে দেয়। যেমন গুজরাঁওয়ালায় একবার ঘটেছিল (১৯৭৪ইং)। তারপরও ঐ মসজিদে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়।

আক্রমণকারীদের সাথে পুরোপুরি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। তাদের সমর্থনে তাদের ইশারায় এসব কাজ হচ্ছিল। আহমদীরা আক্রমণের সম্ভাবনার খবর যথাসময়ে পুলিশকে দিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ আহমদীদের সাহায্য করতে আসে নি। বরং পুলিশ ঐ সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যখন পাঁচজন শহীদ হ'ল এবং

কয়েকজন আহত হয়ে পড়েছিল। শহীদগণের নাম - মুকাররম মুহাম্মদ আরেফ সাহেব, মুকাররম মুহাম্মদ আসগর সাহেব, মুকাররম মাস্টার নাসের আহমদ সাহেব, মুকাররম মুবারক আহমদ সাহেব, মুকাররম মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব। এছাড়া মুকাররম ওয়াসিম আহমদ সাহেব এবং খালেদ মাহমুদ সাহেব আহতদের মধ্যে বেশী আঘাত পেয়েছেন।

আরো একটি অজুহাত তারা পেশ করেছে যে, ঐ গ্রামের আহমদীরা প্রভাবশালী এবং সম্পদশালী হওয়াতে গ্রামের মধ্যে এক ধরনের গুমোট পরিবেশ বিরাজ করত। প্রশ্ন হ'ল, আহমদীরা যদি অবস্থাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী হয় তবে পরিবেশের মধ্যে গুমোটভাব সৃষ্টি হবে কেন? অন্যের সম্পদের কারণে বাকীরা জ্বালা অনুভব করবে কেন? সম্পদতো ক্রয় করাও সম্ভব।

আবার লিখেছে, কাদিয়ানীরা বাহু বলে সরকারী খাস জমি জবর দখল করে রেখেছে। অথচ আসল ঘটনা এই, আহমদীয়া মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন আহমদীদের নিজস্ব জমি। প্রমাণ এই যে, আতহার শাহ্ উক্ত মসজিদের জমির বিরুদ্ধে মামলা আদালতে নিয়ে গিয়েছিল। বর্তমান বিরোধিতার পরিবেশ সত্ত্বেও আদালত কাগজপত্র দেখে আহমদীদের পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হয়েছে।

আরও একটি মুখরোচক ঘটনা ঐ পত্রিকার প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে লিখেছে – "একজন কৃষকের ছেলের হাত মেশিনে কাটা পড়েছিল। কাদিয়ানীরা যথারীতি ঘোষণা করেছিল যে, ঐ যুবকের হাত কেটেছে মির্যা তাহের আহমদের বদ-দোয়ার ফলে।" যখন এ কথাটি বেশী বেশী প্রচারিত হ'ল, গ্রামবাসী প্রতিবাদে মিছিল বের করেছিল। অথচ এ ঘটনা বহু পূর্বের ঘটনা। প্রায় দেড় দু'মাস পূর্বের ঘটনা। আহমদীরা সে রকম প্রচারও করে নি। হয়ত এটাও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে অথবা হয়ত কোন আহমদী ব্যক্তিগতভাবে কথা-বার্তায় কোথাও এমন কথা বলেও থাকতে পারে। কিন্তু একথা সত্য যে, জামাতের পক্ষ থেকে এমন দাবী বা যথারীতি বক্তব্য অবশ্যই উপস্থাপন করা হয় নি।

আমার বদ-দোয়া কীভাবে ঐ যুবকের বিরুদ্ধে আরোপিত হতে পারে যখন একথা মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমি জানতে পেরেছি। আমারই তো এখন শুনে আফসোস্ই হচ্ছে। মৌলভীরা নিজ ভাগ্য দোষে এসব কথা বলছে।

পত্রিকায় লিখছে, আতহার শাহ্ আহমদীদের বিরুদ্ধে যে মামলা আদালতে করে রেখেছে-এর জন্য কাদিয়ানীরা খুব কষ্ট পাচ্ছে। আল্লাহ্র ফযলে এ মামলা খারিজও হয়ে গেছে।

গত বছর আতহার শাহ্ আহমদীদের কবরস্থানে গিয়ে কবরের অবমাননা করেছিল, নাম ফলকগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিল। আদালতের সামনে সে স্বীকারও করেছে যার উল্লেখ আদালতের রেকর্ডে রয়ে গেছে। তাছাড়া অলি-গলিতে আহমদীদের বিরুদ্ধে জগণ্য স্লোগানও লিখিয়েছে। এ বিবরণ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তাই এখানেই শেষ করছি।

আহমদীদের উপর আক্রমণ ও শাহাদত বরণের পরেও তারাই আহমদীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। মামলায় লিখেছে" মির্যায়ী কাফির এবং মুরতাদ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে 'ওয়াজিবুল কতল'-অবশ্যই হত্যার যোগ্য"।

তারা যে লিখেছে "ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে 'ওয়াজিবুল কতল' পাকিস্তানের বিচার বিভাগও আজ এই মতবাদের সমর্থন করছে। যে দেশে বিচার বিভাগের এ অবস্থা, যে দেশের হাইকোর্টের বিচারক এমন কি প্রধান বিচারকও এর অন্তর্ভুক্ত, সে দেশে ন্যায়-বিচার কী করে হতে পারে? মৌলভীরা সেখানে আদালতের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। এ যাবৎ পাকিস্তানে ধর্মীয় কারণে ৩,০০৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়েরকৃত আছে।

তাখ্ত হাজারার এ লোমহর্ষক ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটিয়ালীয়াঁন (জেলা সিয়ালকোট) গ্রামে এক সহিংস ঘটনায় পাঁচ আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে। এখানেও কি মির্যা তাহের আহমদের কোন বিয়ে হয়েছিল?

১৯৮৩ইং সাল থেকে আজ পর্যন্ত আহমদীদের নিজ শহরে সকল প্রকার ধর্মীয় সভা ও ইজতেমা এ সবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে আছে। অথচ মৌলভীরা প্রতিবছর কয়েকবার করে সেখানে জলসা-ধর্মীয় সভা করে, মিছিল বের করে যার মধ্যে আহমদীদের বিরুদ্ধে জঘন্য গালি-গালাজ করা হয়। প্রকাশ্যে আহমদীদের হত্যার হুমকী দেয়া হয়। আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত ঘৃণ্য বিবৃতি ও খবর পত্রিকায় ছাপা হয়।

উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিবৃতিদাতাদের মধ্যে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরাও আছেন। যেমন বিচারপতি মিয়াঁ নাযির আখতার, মিয়াঁ মুনির আহমদ। বিচারপতি নাযির আখতার আজকাল লাহোর হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পদে সমাসীন। লাহোরের আহমদী বিরোধী এক জনসভায় উক্ত বিচারপতিদ্বয় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের বক্তব্য দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে। নমুনা দেখুন,

"শানে নবীর অবমাননাকারী সকল মুখের জিহ্বা কেটে দেয়া হোক" -বিচারপতি মিয়াঁ মুনির আহমদ।

সেখানে যারা শানে নবীর অবমাননাকারী তারা নিজেদের জিহ্বা কাটিয়ে নিন এবং বলা বন্ধ করে লেখা আরম্ভ করে দিন। অত্যন্ত জালেম এবং লজ্জাহীন লোক এরা!

আহমদীরা নবীর মর্যাদার অবমাননাকারী? আহমদীরাতো নবীর মর্যাদার খাতিরে শাহাদত বরণ করে যাচ্ছে। প্রশ্নই উঠে না যে, কোন আহমদী নবী (সঃ)-এর মর্যাদার সাথে বেআদবী করবে?

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছে তারাতো ঘোষণা করছে- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্।"** নবীর মর্যাদা তো এটাই যে, তিনি (সঃ) আল্লাহ্র রসূল। কিন্তু আহমদীরা কলেমা পড়লেও তাদের বড় কষ্ট হয় এবং তাদের দৃষ্টিতে এটা নবীর মর্যাদার অবমাননা!

আহমদীরা তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর বিচারপতি মুনির আহমদ বলছেন-"যারা এমন কলেমা পাঠকারী আহমদী তাদের জিহ্বা কেটে দাও।"

পত্রিকায় লেখা হয়েছে "ধর্মের মুরতাদদের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে।" - বিচারপতি নাযির আখতার।

আহমদীদের বিরুদ্ধে জঘন্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী - পোস্টারিং-এর তো কোন সীমা-পরিসীমাই নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বড়ই হৃদয় বিদারক মিথ্যা প্রচারণা চলছে। আহমদীদের হত্যার ফতোয়া প্রকাশ ও প্রচার অব্যাহত আছে।

এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে - "আহমদীদেরকে তিন দিনের সময়-সীমা বেঁধে দিয়ে তাদেরকে অপরাপর দশ কোটি মুসলমানের মত মুসলমান হয়ে যাবার জন্য সাধারণভাবে আহ্বান জানাতে হবে।"

উক্ত দশ কোটি মুসলমান কী ধরনের মুসলমান? তারা কি আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্পর্কে মিথ্যা হওয়ার অভিযোগ আরোপ করে মুসলমান হয়েছে? দশ কোটি মুসলমান তো আঁ হযরত (সঃ)-এর পক্ষে কলেমা শাহাদত পাঠ করে সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে মুসলমান হয়েছে। আর ঐ দশ কোটির মত আহমদীরাও ঐ একই কলেমা পড়ছে। এমন কোন্ অবমাননাকর বক্তব্য বা বিষয় আছে যা তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে আরোপ করছে? এই কলেমা পড়ার অপরাধেই তো তাদের মারপিট করা হচ্ছে। অত্যন্ত অদ্ভুত রকমের নির্যাতন - মানব জাতির ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই!

সাধারণতঃ সত্যতকে স্বীকার করাবার জন্য, কারো মুখ থেকে সত্য উদঘাটনের জন্য তার উপর জোর জুলম-করা হয়। এখানে আহমদীদের মুখ দিয়ে মিথ্যা বলাবার জন্য জোর-জুলুম করা হচ্ছে। আহমদীদের উপর জোর-যুলুম চালানো হচ্ছে, তোমরা বল; "আমরা আহমদীরা যখন কলেমা পাঠ করি তখন আমরা মুখে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম বললেও অন্তরে আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদকে মনে করি।"

প্রশ্নই উঠে না - হতেই পারে না যে, কোন আহমদী অন্তরে এমন মিথ্যা ধারণা পোষণ করবে! জোর-জবরদস্তি তারা মিথ্যা বলাবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে যেসব স্থানে ভয়ঙ্কর ও জুলুম করা হয়েছে সেখানেও শত্রুর মুখ থেকে সত্য বের স্বীকার করার জন্য তা করা হয়েছে।

তারা ঘোষণা করেছে-

যতক্ষণ আহমদীরা মুসলমান না হয়ে যায় - "এদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা শুরু করে দাও-। যতক্ষণ সকল মুসলমান হয়ে না যায়- এসব ধর্মের মুরতাদদেরকে হত্যা করা বন্ধ করা যেন না হয়।" অর্থাৎ পাকিস্তানে আহমদীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। তারপর হতভাগ্য মৌলভীরা তরবারি নিয়ে হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করুক-।

বর্তমান হতভাগা সরকারের কার্যক্রমের প্রতিফলন এই; যারা ঘোষণা দিয়েছিল, কায়েদে আযমের পাকিস্তান তারা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে। কায়েদে আযম তো কখনও এমন স্বপ্নও দেখেন নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি দোয়া পাঠ করে শোনাচ্ছি ঃ

"ইয়া রব্বি ফাস্‌মা দুয়ায়ি ওয়া মায্‌যিক আদায়াকা ওয়া আদায়ি, ওয়ান্‌জিয্ ওয়াদাকা ওয়ানসুরা আব্‌দাকা, ওয়া আরিনা আইয়্যামাকা ওয়া শাহ্‌হির লানা হুসামাকা ওয়া লা তাযার্ মিনাল কাফিরীনা শারীরা" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ৫১০)

অনুবাদ ঃ "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার দোয়া শোন, তোমার ও আমার শত্রুদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও এবং নিজ প্রতিজ্ঞা পালন কর, এবং এ বান্দাকে সাহায্য কর। আমাদেরকে তোমার অঙ্গীকার পুরণ হতে দেখাও। তোমার তরবারী আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত কর এবং যারা দুষ্ট কাফির তাদের কাউকে ছেড়ে দিও না।"

হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়ার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, **"মিনাল কাফিরীনা দায়্যারা"** (সূরা নূহ; ৭১ঃ২৭)। সমস্ত কাফিরদের শেষ করে দাও। কারণ আল্লাহ্ হযরত নূহ (আঃ)-কে জানিয়েছিলেন যে, তারা ও তাদের বংশধররা নাস্তিকই থাকবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দোয়া করেছেন, **"লা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা"** কেবল দুষ্টপ্রকৃতির কাফিরদেরকে শেষ করে দাও। দেশের বাকী মানুষ যেন রক্ষা পায়।"

ইতঃপূর্বেও বলেছিলাম, আবারো বলছি- এ দোয়া অসংখ্যবার পড়তে থাকুন। **আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকীন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হিকা ওয়ালা তাযার আলাল আরযে মিনাল কাফিরীনা শারীরা।"**

অবশেষে হযরত মূসা (আঃ)-এর বক্তব্য সম্বলিত একটি আয়াত পড়ছি যা আজ আহমদীদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

"এবং তুমি আমাদের থেকে কেবল এ জন্য প্রতিশোধ নিচ্ছ যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি যখন ওগুলো নাযেল হয়েছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে মুসলমান থাকা অবস্থায় মৃত্যু দাও" (সূরা আ'রাফ ; ৭ঃ১২৭)"।

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

(অমৃতবাণীঃ ৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সত্যবাদীদের জন্য এই অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকাটাই হ'লো শেষ এবং কঠিন স্তর। আত্ম-শ্লাঘা ও ঔদ্ধত্য এসব অভিশাপেরই ফলশ্রুতি। এবং অনুরূপভাবে কখনো 'ক্রোধ' স্বয়ং আত্ম-শ্লাঘা ও ঔদ্ধত্যের পরিণাম হয়ে থাকে। কেননা, ক্রোধ বা অহঙ্কার তখন জন্মায় যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, **আমি এটা চাই না যে, আমার জামাতের লোকেরা আপোষে একে অপরকে ছোট বা বড় মনে করে,** অথবা একে অপরের প্রতি অহঙ্কার করে অথবা ঘৃণার চোখে দেখে, কে বড়, কে ছোট - খোদা তা জানেন, ইহা এক প্রকার ঘৃণা। যার মধ্যে ঘৃণা রয়েছে, ভয় হয় যে- এই ঘৃণা বীজের মত বৃদ্ধি পেয়ে তার ধ্বংসের কারণ না হয়ে যায়।. কতো লোক বড়দের সাথে দেখা হ'লে অতি শিষ্টাচার দেখায় কিন্তু সেই ব্যক্তিই বড় যে গরীবের কথা বিনয়ের সাথে শ্রবণ করে, তাকে সন্তুষ্ট করে,তার কথার সম্মান দেয়, কোন অবজ্ঞাসূচক (বিরক্তিকর) কথা উচ্চারণ করে না যাতে সে দুঃখ পায়। খোদাতাআলাই বলেছেনঃ "এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দুষণীয় নাম (দ্বারা অভিহিত হওয়া) বড়ই মন্দ বিষয়। এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম" (৪৯ঃ১২)। একে অপরের নাম ব্যঙ্গ করে উচ্চারণ করবে না। এসব দুষ্ট ও অসাধু লোকের কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, সে নিজে এরূপ (ঘৃণিত) অবস্থায় পতিত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না। নিজের ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে করবে না। একই উৎস থেকে যেহেতু সবাই পানি পান করছো সে ক্ষেত্রে কার অদৃষ্টে রয়েছে যে, সে বেশী পানি পান করবে? পার্থিব কোন নীতি অনুসরণে মহৎ সম্মানিত হওয়া যায় না। খোদাতাআলার নিকট সেই ব্যক্তিই বড়, যে মুত্তাকী। "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সব খবর রাখেন" (৪৯ঃ১৪)।

জাতের পার্থক্য

এই যে বিভিন্ন জাত রয়েছে এটা কোন ভদ্রতার কারণ নয়। শুধু পরিচয়ের জন্য খোদাতাআলা এই জাতের সৃষ্টি করেছেন। আর আজ কালতো চার পুরুষের (বংশের) পরই সঠিক হিসাব পাওয়াটাই মুস্কিল।এই জাতের বিতর্কে জড়ানো মুত্তাকীর মর্যাদা বিরোধী। আল্লাহ্‌তো বলেই দিয়েছেন, "আমার নিকট 'জাত' কোন উপাধি নয়। কেবল তাকওয়াই হ'লো সম্মান ও মহত্তের কারণ।"

মুত্তাকী কে?

খোদার বাণী থেকে জানা যায় যে, সেই ব্যক্তি মুত্তাকী যে তার চালচলনে বিনয়ী ও নম্র। সে গর্বভরে কথা বলে না। তার কথা-বার্তা ঠিক তদ্রূপ, যেভাবে ছোট বা বড়দের সাথে কথা-বার্তা বলে থাকে। আমাদের সর্বদা সেই -রূপ কাজ করা উচিত যদ্বারা আমাদের মুক্তি লাভ হয়। আল্লাহ্‌তাআলা কারো ঠিকাদার নন, তিনি চান প্রকৃত তাকওয়া (খোদা-ভীতি)। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে উন্নত স্তরে পৌঁছবে। আঁ হযরত (সঃ) অথবা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে কেউ ওয়ারীশ সূত্রে তো সম্মান লাভ করেন নি। যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্ মুশরিক ছিলেন না; কিন্তু তিনি তো নবুওয়ত দান করেন নি। এটাতো ছিল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, ঐ সাধুতার ফসল যা তাঁর (সঃ) স্বভাবে নিহিত ছিল। এটাই অনুগ্রহ লাভের প্রেরণা ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), যিনি আবুল-আম্বিয়া (নবীদের পিতা) ছিলেন তিনি নিজের সততা ও তাকওয়ার কারণেই ছেলেকে কুরবানী করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, নিজে আগুনেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন (১ম খন্ড)।

অনুবাদ - **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৭তম সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ

- আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ

উপস্থিত বুযূর্গ ভাইয়েরা এবং বোনেরা, আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ্‌র কাছে আমরা শুকরিয়া আদায় করি, আজ আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৭তম জলসা শুরু করতে যাচ্ছি। এই জলসার একটি বিশেষত্ব এবারকার ন্যাশনাল সালানা জলসা, নতুন শতাব্দী ও নতুন সহস্রাব্দের প্রথম জলসা। এইজন্য আমি আল্লাহ্‌র দরবারে হাজার শুকরিয়া আদায় করি কেননা, নানা বাধা-বিপত্তি এবং দেশের প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ফযলে আল্লাহ্-প্রেমিক ভাই-বোনেরা এই জলসায় শামিল হয়েছেন। এ জন্য আমি আবারও আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। এই জলসায় আমরা কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সঃ)-এর ভালবাসায় একত্রিত হয়েছি। এই জলসা ইসলামের উন্নতির জন্য দোয়ার জলসা। এই জলসা আন্তরিকতার সাথে দুরূদ প্রেরণের জলসা। যা কিছু আমরা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে লাভ করেছি তা মহানবী রহ্‌মাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বরকতে লাভ করেছি। এটা কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জলসা নয়। একমাত্র আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি লাভই কাম্য। এ প্রসংঙ্গে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন, এই জলসাকে অন্যান্য সাধারণ জলসার ন্যায় মনে করবে না। এটা সেই আয়োজন যার একমাত্র উদ্দেশ্য, "ইলায়ে কালেমাতুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামের সঠিক মান ও মর্যাদা জগতে প্রতিষ্ঠা করা। হাদীসে আছে, **হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমানে** অর্থাৎ দেশ-প্রেম ঈমানের অঙ্গ। আমাদেরকে দেশ-প্রেমিক হিসেবে দেশের জন্য কাজ এবং দোয়া করাও প্রয়োজন। আরেক হাদীসে আছে, **আদ্দিনু ইউসরুন** অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম খুবই সহজ। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্যের ধর্ম, বল প্রয়োগের ধর্ম নয়, যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে, **লা ইকরাহা ফিদ্দীন** অর্থাৎ ধর্মে বল প্রয়োগ নেই। তাই অশান্তির পথ হ'তে বাঁচার একমাত্র সঠিক পথ হ'ল প্রকৃত ইসলামকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা। এই জামাতের কোন তুলনা নেই, কেবল লিল্লাহি ভালবাসার ভিত্তিতে এই আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত। যুগ-খলীফার অধীনে নিজেদের ধন, মান, ইজ্জত, জান ও প্রাণ দিয়ে এর সদস্যরা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত। আজ যুগ-খলীফার অধীনে সারা বিশ্বের ১৭০টি দেশে ইসলামের প্রচারের কাজ চলছে। রসূল করীম (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তি কলেমা পড়ে সে মুসলমান। হাদীসে আছে - যদি এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কাফির ফতোয়া দেয় তবে যদি সে কাফির না হয়ে থাকে, তাহলে যে ফতোয়া দেয় তার উপরেই তা বর্তায়। সুতরাং এ হিসাবে যদি আমরা যাচাই করি দেখবেন প্রত্যেক ফিরকা প্রত্যেককে কাফির ফতোয়া দিচ্ছে, এতে দেখা যায় যে, দুনিয়াতে মুসলমান বলতে কেউই নেই, সব কাফিরে পরিণত হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ্)। কিন্তু একমাত্র আহমদীয়া জামাত এই ফতোয়া দেয়া থেকে ব্যতিক্রম, আহমদীরা কাউকে এই ফতোয়া দেয় নি আজ পর্যন্ত। সুতরাং আমি ভাইদেরকে বলবো, আপনারা দেখেন বর্তমান জমানাতে যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আপনারা জানেন, আমাদের দেশে এই ফতোয়ার জন্য কি অঘটন ঘটছে, যেটা ইসলামে কোন রকমে সায় দেয় না। সুতরাং যে প্রকৃত ইসলাম, সেই ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। সেই ইসলাম হ'ল সাম্যের ধর্ম, মহব্বতের ধর্ম। আমরা যদি ফতোয়া দিয়ে মানুষকে কাফির বানিয়ে ফেলি তা হ'লে আমরা রসূল করীম (সঃ)-এর আদেশ কি মান্য করলাম? রসূল (সঃ) বিদায় হজ্জে তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের কাছে সংবাদ পৌছাতে পেরেছি? তখন প্রায় এক লাখ লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সবাই সাড়া দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ' আপনি সংবাদ পৌছাতে পেরেছেন। তখন রসূল করীম (সঃ) তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন, পরর্তীতে মানব জাতির কাছে এই সংবাদ পৌছানোর দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হ'ল। আমরা কি সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? কাফির ফতোয়া দিয়ে যদি আগেই আমরা দূর করে দেই তাহলে তাদের কাছে কি করে আমরা পয়গাম পৌছে দেব। একমাত্র পয়গাম পৌছানোর উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে মহব্বত-ভালবাসার সঙ্গে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন ব্যক্ত করা হ'লেই তারা ইসলাম কবুল করবে। এই জন্য পরিতাপের সঙ্গে বলতে চাই, এই শান্তির ধর্ম ইসলামকে তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ী ফতোয়াবাজ উলামাদের দ্বারা কুলষিত করা হচ্ছে। ইসলামকে বিধর্মীরা মনে করে, এটা সন্ত্রাসীদের ধর্ম। এর কারণ দুনিয়ার যে দিকেই তাকান মুসলমান যেখানে দেখবেন কেবল সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে সেখানে। আমাদের মৌলানারাতো, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি সব মুসলিম কান্ট্রিতে খুব শক্তি দেখায়। কিন্তু বিদেশীদের কাছে, অথবা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে তারা প্রচার করতে পারে না। একমাত্র আহমদী জামাত আল্লাহ্‌র খলীফার ছায়াতলে, সারা বিশ্বে **ইসলাম** প্রচারে নিয়োজিত। তাঁর নেতৃত্বে আল্লাহ্‌র ফযলে ১৭০ টি দেশে ইসলামের ঝান্ডা উড়ছে। আহমদী জামাতের খলীফা বলতে পারেন যে, **তাঁর রূহানী সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না**। আমি ভাইদেরকে এই জলসার উদ্দেশ্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভাষায় পেশ করছি ঃ **জলসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন**, এই জলসা হ'ল রব্বানী কথাবার্তা শুনার জন্য, দোয়ায় অংশ গ্রহণ করার জন্য ঐ তারিখে এখানে এসে যাওয়া উচিত। আর এ জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্ব-জ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকবে, যা ঈমান, প্রতীতি ও তত্ত্ব-জ্ঞানে বুৎপত্তি দানের জন্যে আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্যে বিশেষ দোয়া, এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুক সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে যেন খোদাতাআলা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। একই সত্তায় পরিণত

করার জন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করা হবে। **যারা যোগদান করবেন না তাদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন**, যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে, **জলসায় আসলে** তার ওপরে বোঝা পড়ে বা এরূপ মনে করে যে, এখানে অবস্থান কালে আমাদের ওপরে বোঝা চাপে, তার ভয় করা উচিত যে, সে শিরকে নিপতিত। আমাদের বিশ্বাস তো এই যে, যদি সমগ্র জগৎ আমাদের পরিবার হয়ে যায় তাহলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ সুসম্পন্ন করার জন্যে আমাদের খোদাতাআলা আমাদের অভিভাবক। আমাদের ওপরে কোন বোঝা নেই। **যে সকল ভাই এই জলসায় যোগদান করবে তাদের সম্বন্ধে মসীহ মওউদ (আঃ) দোয়া করেছেন**। যারা এই লিল্লাহি জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন খোদা তাদের সহায় হউন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়া পরবশ হউন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দঃখ-কষ্ট হ'তে তাদের নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কায সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। এবং হাশরের দিনে তাদেরকে খোদা তাদের সেই সকল বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর রহমত ও ফযল বর্ষিত হয়েছে, এবং তাদের সফরের সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হউন। হে খোদা, হে মর্যাদাবান ও দানশীল ও পরমদয়াবান ও সমস্যা সমধানকারী খোদা এই সব দোয়াই তুমি কবুল কর, এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী এক মাত্র তুমিই, আমীন সুম্মা আমীন" (বিজ্ঞাপন ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ ইং)।

সুতরাং আমি আমার ভাইদেরকে বলবো, আমরা যেন মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার বরকত লাভ করতে পারি। এজন্য আমাদেরকে এখানে এই তিন দিন দোয়ায় রত থাকতে হবে এবং সফলতার সাথে আমরা যেন এই জলসা অনুষ্ঠিত করতে পারি। এই জলসার পরিচালনার জন্য যে ভাইয়েরা কাজ করেছেন তাদের জন্য আমি দোয়া করি, তারা অতি পরিশ্রম করে দিন রাত পরিশ্রম করে, এই জলসাকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, এবং যারা আপনাদের খেদমত করেছেন তাদের জন্য আপনারাও খাসভাবে দোয়া করবেন। আর আমি চাই যে, আমাদের অনেক নতুন ভাই এসেছেন, অনেক ভাই অনেক দূর থেকে আমাদেরকে জানার জন্য আসছেন, তাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন, তারা যেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করতে পারেন। আপনারা জানেন, ইসলামের বিজয় ইমাম মাহদী (আঃ) -এর মাধ্যমে হবে রহ্‌মাতুল্লীল আলামীন বলে গেছেন। সেই রহমাতুল্লীল আলামীনের কল্যাণে কাজ হবে। এই ইসলামের বিশ্ব-বিজয় কার দ্বারা হবে ? আমাদের মুসলমান জাতি, চাতক পাখির মত শত শত বছর যাবৎ তাকিয়ে আছে যে, কবে ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হবেন। তাঁর হাতে বয়াত করবেন এবং রসূল করীম (সঃ)-এর সালাম পৌছাবেন। অথচ ইমাম মাহদী (আঃ) যথাসময়ে এসে গেছেন। বাংলাদেশে ৭৭টি সালানা জলসা হয়ে গেছে। বাংলদেশে আল্লাহ্‌র ফযলে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীও ছিলেন। এটা সাহাবীর মাটি। সুতরাং আপনারা বাংলাদেশের এই সাহাবীর সন্তান-সন্ততি। আমি আমার ভাইদেরকে বলবো, আমরা যেন তাড়াতাড়ি ইমাম মাহদী (আঃ)-কে প্রকৃতভাবে গ্রহণ করতে পারি তা হলেই আমরা প্রকৃত অর্থে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পালোয়ান হবো। সুতরাং আমি এই ভাইদেরকে বলবো, এই জলসাকে যেন সাফল্যজনকভাবে শেষ করতে পারি এ জন্য আপনারা খাসভাবে দোয়া করবেন। চলুন আমরা দোয়া করি। এখানে যে ভাইয়েরা এসেছেন তাদের যেন সমস্ত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ্ পুর্ণ করেন এবং আমাদের এই জলসার উদ্দেশ্যে আগত ভাইয়েরা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যে দোয়া করেছেন সে দোয়ার যেন অংশীদার হতে পারেন। আসুন আমরা সবাই দোয়া করি (আমীন) (অডিও কাসেট থেকে ট্রান্সক্রিপশনকৃত)।

শুভ বিবাহ

আহমদীয়া মুসলিম, জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পাওয়ার হাউস রোড (কান্দিপাড়া) নিবাসী জনাব নাসির আহমদ ভুঁইয়া (বর্তমানে পাকিস্তানের করাচীতে বসবাসরত) ও মিসেস হাবিবা আক্তারের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ সাবরিনা সুলতানার (হুমায়রা) শুভ বিবাহ বাড়ী নং-১০, লেন নং-১৩, আল্ আমীন রোড, কোনাপাড়া, ডেমরা-ঢাকা নিবাসী জনাব বশীর আহমদ ও মিসেস ফাতেমা বশীর সাহেবার ২য় ছেলে শাকিল আহমদ পাপা-এর সাথে ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০১ইং রোজ শুক্রবার বাদ নামায জুমুআ ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিল্‌সিলাহ্ উক্ত বিবাহের এলান করেন। পরে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আল্‌হাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব দোয়া.করান। উল্লেখ্য যে, মেয়ের বড় মামা জনাব মাহবুবুর রহমান এই বিয়ের অলির (অভিভাবকের) দায়িত্ব পালন করেন।

এই বিবাহ যেন সকল দিক থেকে বাবরকত হয় ও জামাতের জন্য কল্যাণমন্ডিত হয় সেজন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট আন্তরিক দোয়ার আবেদন করছি।

- মাহবুবুর রহমান
আহমদীয়া পাড়া, বি.বাড়ীয়া

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার কন্যা মমতাজ বেগম (সাথী) ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। সে ১৯৯৮ইং সালের এস এস সি পরীক্ষায় স্টার মার্কস নম্বর-৮২৮, ২০০০ইং সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় স্টার মার্কস নম্বর-৮০১ পেয়ে সোনালী ব্যাংক ব্যবস্থপনা পরিচালক স্বর্ণ পদক পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বর্তমানে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Applied Chemistry-তে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে সে যাতে উচ্চতর শিক্ষায় আরও ভাল ফলাফল করতে পারে সে জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন রইলো।

-আব্দুল কাদির
ফতুল্লা

মিনহাজুত্‌তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(২৬তম কিস্তি)

এথেকে জানা গেল যে, খোদাতাআলা মানুষকে এজন্যে সৃষ্টি করেন নি যে, কতক কাজ করবে না বরং এজন্যে সৃষ্টি করেছেন যেন কাজ করে। সুতরাং ইহা বলা হয় নি যে, আমরা মানুষকে এজন্যে সৃষ্টি করেছি যেন অমুক কাজ না করে। বরং ইহা বলেছেন যে, আমরা এজন্যে সৃষ্টি করেছি যে, ইবাদত করে। সুতরাং দুনিয়াতে কাজ করার জন্যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্যে নয় যে, কিছুই না করে বিরত থাকার মধ্যে মূলতঃ কল্যাণ অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে বাধাসমূহ ওগুলোকে পৃথক করে দাও। কিন্তু উদ্দেশ্য নেতিবাচক হয় না। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি নেতিবাচক হতো তাহলে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কী ছিলো? ঐ উদ্দেশ্য তো তাকে সৃষ্টি না করলেই বরং অধিকতর ভালভাবে পূর্ণ হচ্ছিলো। এর উদ্দেশ্য তো ঠিক তেমনই যেমন হিন্দুদের খোদার পরিচয় তো এই যে, তিনি ইহাও নন আর উহাও নন। খোদাতাআলা মানুষকে উদ্দেশ্যহীন নয় বরং ইতিবাচক কর্মের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। যদিও নেতিবাচক বিষয়াবলী ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সংযোজিত করা হয়েছে। সুতরাং আসল বিতর্ক তো এই যে, মানুষ কী কী হবে, ইহা নয় যে, কী কী হবে না।

দ্বিতীয় কথা যা আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারি না, তাহলো এই যে, সত্তার দৃষ্টান্ত একটি ঘোড়ার ন্যায়। নিঃসন্দেহে ঘোড়াকে ব্যায়াম করানো আবশ্যক। আর এতটা ক্ষীণ দেহ সম্বলিত রাখা দরকার যে, অযথা আরোহীকে ফেলে না দেয়। কিন্তু এমন কোন ব্যক্তিকেও কি দেখা গেছে যে, ঘোড়াকে কৃশ করে করে আরোহীতে পরিণত হয়েছে? কোন এক ভ্রমণে এক বন্ধু, যে আরোহী ছিলো না, সে বলতে লাগলো আমি ঘোড়ায় চড়বো না। যদি আরোহণ করতেই হয় তাহলে কোন কৃশ ঘোড়া নিয়ে আস। তার একথা বলার পরে একটি কৃশ ঘোড়া নিয়ে আসা হ'ল। তখন সে উহাকে দেখেও ভীতি প্রকাশ করতে লাগলো আর বলতে থাকলো, এর চেয়ে কৃশ আর ছোট্ট ঘোড়া কি নেই? সুতরাং আরোহণ করার সামর্থ্যই যদি না থাকে তাহলে ঘোড়াকে কৃশ বানালেও কাজে আসতে পারে না। এজন্যে সত্তাকে শীর্ণ করতে করতে ইহা মনে করা যে, আমরা একে করায়ত্ত করবো, আর যেভাবে চাইবো উহাকে চালাবো, একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। কেবল সত্তাকে শীর্ণ করা দ্বারা নয় বরং এর ওপরে বিজয়ী হওয়ার কৌশল শিখা দ্বারা সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

তৃতীয় কথা, যা আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারি না তাহলো, সত্তা নিয়ন্ত্রণে আসা দ্বারাই পাপ সৃষ্টি হয় না বরং সত্তার মরে যাওয়াতেও সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, অনাত্মাভিমান। ইহা সত্তার বিনাশ সাধনে সৃষ্টি হয়- এমন সময় তো ইহা আবশ্যক হয়ে থাকে যেন সত্তায় শক্তি সৃষ্টি করা হয় যে উহা এমতাবস্থায় কার্যকর হতে পারে।

মোটকথা যেভাবে কাজ নেবার জন্যে ঘোড়াকেও কখনও কৃশ বানানো হয়ে থাকে আর কখনও মোটা, এমন অবস্থা সত্তারও হয়ে থাকে। উহাকে একেবারেই মেরে ফেলাও উচিত নয় আর কোন কথাই মান্য করে না, এমন বিদ্রোহীও বানানো উচিত নয়।

চারিত্রিক দর্শনের প্রসঙ্গে গায্যালী (রহঃ) ও হযরত মসীহ্ মাওউদ আলোয়হেস সালামের বর্ণিত পদ্ধতিতে ইহাও একটি পার্থক্য যে, তিনি (আঃ) এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈমানের ভিত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপরে। কুরআন করীমে ইহা এসেছে যে, আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি ঈমানের অবস্থান; কিন্তু একথা বলা হয়ে নি যে, আশা আর নিরাশার মধ্যিখানেই ঈমানের অবস্থান। নৈরাশ্যের প্রসঙ্গে তো এতটা বলা হয়েছে যে, **ইন্নাহু লা ইয়াইয়াসু মির রওহিল্লাহি ইল্লাল কৃওমিল কাফিরূন** অর্থাৎ কাফিররাই নিরাশ হয়ে থাকে। মু'মিন নিরাশ হয় না। তাই ঈমানের দর্শন আশার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। আর হাদীসে এসেছে- যেভাবে বান্দা ধারণা করবে সেভাবেই খোদা তার সাথে ব্যবহার করবেন। সুতরাং এমন কোন পদ্ধতি যদ্বারা নৈরাশ্য সৃষ্টি হয় উহাকে ইসলাম বলা যায় না। কিন্তু ভীতির বেলায়ও ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উহা আশার চেয়ে কম হয় আর আশা ভীতির তুলনায় অধিক হয়। নিঃসন্দেহে ভীতি ঈমানের অংশ কিন্তু আশার চেয়ে অধিকতর কম। খোদাতাআলা বলেন, **রহমাতি ওয়াসি'আত কুল্লা শায়ইন** অর্থাৎ আমার কৃপাগুণ ক্রোধ গুণের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। এথেকে জানা গেল, বান্দার প্রাণেও ভীতি থেকে আশার সঞ্চার অধিক শক্তিশালী হওয়া দরকার।

মু'মিনের প্রাণ আশায় ভরপুর থাকে। নিঃসন্দেহে তাতে ভীতিও নিহিত থাকে। কিন্তু তা কম। সে মনে করে, খোদাতাআলা আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করবেন না যে, আমি বিনাশপ্রাপ্ত হই। যদি আমরা মু'মিনের ভীতি ও আশার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে সুস্পষ্টভাবে ইহা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যে, তার ভীতি খোদাতাআলার প্রতি কু-ধারণার ফলে হয় না বরং স্বীয় দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু তার আশা খোদাতাআলার আশিসের কারণে হয়ে থাকে। এখন ইহা কি সত্যি নয় যে, আমাদের দুর্বলতা খোদাতাআলা আশিসের তুলনায় নগণ্য? তাই যদি মু'মিনের ভীতি খোদাতাআলার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রেখে হয়ে থাকে তাহলে তাঁর কৃপা তাঁর স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ওপরে বিজয়ী, যদি নিজের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে হয় তখন খোদাতাআলার শক্তি আমাদের দুর্বলতার ওপরে বিজয়ী। সুতরাং যাই হোক আশার বিষয়টিই বিজয়ী থাকলো। কেননা, উহার (আশার) সঞ্চারক ভয়-ভীতির সঞ্চারক থেকে সব দিক থেকে শক্তিশালী।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আশা আনুগত্যকারীর জন্যে হয়ে থাকে বিদ্রোহীর জন্যে নয়। কোন মানুষ ইহা যেন না বলে যে, যা খুশী তা-ই করবো আবার আশাও রাখবো যে, খোদাতাআলার কৃপার যোগ্য হয়ে যাবো। ইহা বিদ্রোহিতার শামিল। আর বিদ্রোহীর জন্যে কোন আশা-প্রত্যাশা থাকতে পারে না। আশা আনুগত্যকারীর ভাগ্যেই জুটে থাকে।

দ্বিতীয় এ কথাটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মু'মিনের ভীতির কারণ ইহা নয় যে, সম্ভবতঃ ইহা না-ও হতে পারে, বা এমনটি না করলে শাস্তি পাবো বরং তার এ ভীতি এজন্যে হয়ে থাকে যে, যে পথে আমি চলছি এ পথে চলে সম্ভবতঃ (সফলতা) না-ও হতে পারে। এভাবে ভয়ের কারণ ইহা নয় যে, এ কাজ না করলে তো খোদাতাআলা শাস্তি দিবেন বরং ইহা হয়ে

থাকে যে, সম্ভবতঃ আমি খোদাতাআলার কৃপাকে আকর্ষণ করতে পারবো না।

মোট কথা আসল ইসলামী সুফীবাদের ভিত্তি আশা ও ভীতির ওপরে। আর আশার বিষয়টি ভীতির তুলনায় ভারী। এবং সত্য ইহাই যে, ইতিবাচক শক্তিসমূহ আশা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ভীতি থেকে নেতিবাচক শক্তিসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আসল উদ্দেশ্য খোদাতাআলার সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করা আর তা আশা দ্বারাই সৃষ্টি হয়। ভয়-ভীতি দ্বারা কেবল পাপ দূরীভূত হয়ে থাকে। দেখো ! রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কীভাবে স্বীয় উম্মতকে ভয়-ভীতি দূর করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ তো কুরআন করীমে **রহমাতি ওয়াসিআত কুল্লা শায়ইন**- আশা দ্বারা জানা যাবে যে, খোদাতাআলার কৃপা সকল বস্তু থেকে অধিক। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উহার আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- সতর্ককারী স্বপ্ন শয়তানী হয়ে থাকে আর সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্নসমূহ খোদাতাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যেহেতু মানুষের সত্তার ওপরে স্বপ্নের খুবই প্রভাব পড়ে থাকে এজন্যে তিনি (সঃ) ইহা বলে দিয়েছেন যে, সতর্ককারী স্বপ্নগুলোতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। ইহা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাই যে, সতর্ককারী স্বপ্নসমূহ নবী (আঃ)-গণও দেখে থাকেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, প্রত্যেক সতর্ককারী স্বপ্ন শয়তানী হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ এই যে, যদি খুব বেশী বেশী সতর্ককারী স্বপ্ন দেখা হয় এবং সুসংবাদ সম্বলিত স্বপ্ন দেখাই যায় না বা খুব কম দেখা যায় তখন ওগুলোকে শয়তানী-স্বপ্ন মনে করা উচিত। এভাবে তিনি (সঃ) মু'মিনদের অন্তরের ভীতি দূরীভূত করে দিয়েছেন। কেননা, মানুষের হৃদয়ে স্বপ্নের প্রভাব বিশেষভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এমন ব্যক্তি যারা শয়তানী-স্বপ্ন দেখে থাকে তাদের বেলায় ইহা হ'তে পারে যে, তারা সত্য-স্বপ্নও দেখতে পারে এবং তারা ইহাকে শয়তানী মনে করে ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে পারে তাই তাদেরকে এরও চিকিৎসার কথা বলে দিয়েছেন যে, যখন ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখা যায় তখন মু'মিনদের বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করা এবং **'লা হাওলা'** পাঠ করা আবশ্যক। এতে কী আশ্চর্য বিষয়ই না তিনি (সঃ) বর্ণনা করেছেন! লোকেরা কোন্ বিষয়ে কেন থু থ নিক্ষেপ করে? এজন্যে যে, আমি এতে ভ্রূক্ষেপও করি না। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শয়তানী-স্বপ্নের ব্যাপারে মু'মিনদের মনে সাহস যুগিয়েছেন যে, যখন ওরূপ স্বপ্ন দেখো তখন থু থু নিক্ষেপ করো যে, আমি এতে ভ্রূক্ষেপও করি না। এ পদ্ধতিতে তিনি (সঃ) আশা ও সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় চিকিৎসা **'লা হাওলা'** পাঠ করতে বলেছেন। কেননা, যেভাবে ওপরে বলা হয়েছে- সম্ভাবনা রয়েছে যে, এসব স্বপ্নে কোন সত্য-স্বপ্নও নিহিত থাকতে পারে। অতএব **'লা হাওলা' (লা হাওলা ওয়ালা কুত্তওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আযীম-** অর্থাৎ সেই মহান উচ্চ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী নেই - অনুবাদক) পাঠ করা দ্বারা খোদাতাআলার সন্নিধানে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও তাঁর সত্তার ওপরে ভরসার সুযোগ লাভ হবে। মোটকথা থু থু নিক্ষেপ করা দ্বারা স্বপ্নের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে আর **'লা-হাওলা'** পাঠ করার ফলে ঐশী-ভীতির প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কেননা, যে ব্যক্তি খোদাতাআলার সমীপে নিজেকে সমর্পণ করে সে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে সুতরাং যে ব্যক্তি এ উভয় চিকিৎসা অবলম্বন করবে তার মন থেকে ভীতি দূরীভূত হয়ে যাবে। দেখো, কেমন সূক্ষ্ম ও উত্তমভাবে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের ওপর থেকে ভীতির আধিক্য দূরীভূত করেছেন। (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

দোয়ার শর্ত

"তাযকেরাতুল আউলিয়া পুস্তকে লেখা আছে যে, জনৈক ব্যক্তি এক বুযূর্গের নিকট দোয়ার জন্য আবেদন করলে বুযূর্গ বলেন, "দুধ ও চাউল নিয়ে এসো।" সেই ব্যক্তি প্রথমে বিস্মিত হয়ে যায়, পরে দুধ ও চাউল নিয়ে আসে। বুযূর্গ দোয়া করেন এবং তার কাজ হয়ে যায়। পরে তাকে বলা হয় যে, ইহা তো ছিল কেবল সম্বন্ধ সৃষ্টি করার জন্য।

তেমনিভাবে বাবা ফরিদ সাহেবের তাযকেরাতেও লেখা আছে যে, এক ব্যক্তির দলীল হারিয়ে যায়। সেই ব্যক্তি দোয়ার জন্য তাঁর নিকট আসে। তিনি তাকে বলেন "আমাকে হালুয়া খাওয়াও" আর (ঘটনাক্রমে) হালুয়ার দোকানেই তার দলীল পেয়ে যায়।

(মলফুযাত, নবম খন্ড, ২৪ পৃঃ, পুরাতন সংস্করণ)

[সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ মাসের মাসিক খালিদ-এর সৌজন্যে]

সংগ্রহ ও অনুবাদ - **শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ**

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

নাম ঃ তানিয়া বেগম
পিতা ঃ আব্দুস সালাম
দাদা ঃ আব্দুল মন্নাফ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী
জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ
নম্বর - ১২৮০৬ এ
জন্ম তারিখ ঃ ২৭/১০/৯৮ইং

মালয়েশিয়াস্থ বাঙ্গালী আহমদীদের জ্ঞাতব্য

যেসকল বাঙ্গালী আহমদী মালয়েশিয়াতে অবস্থা করছেন তাদের ও তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচেচ্ছ, তারা যেন নিম্নোক্ত ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে বা পত্র যোগে যোগাযোগ করে জামাতী কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন।

মাহমুদ আহমদ ফারুকী
চেয়ারম্যান বাংলা ডেস্ক, মালয়েশিয়া
Branch : Lot 687, Jalam Saujana-1
Taman Saujana 81750, Plentong
Johor, Bahru, Johor, Malaysia
Phone : 07-3517308

যীশুখ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন

(আকাশে গমন ও পুনঃ আগমনের ধারণা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইভাবে, আল্ কুরআন যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনীকে সুনিশ্চিতভাবে অস্বীকার করে। (এ সম্বন্ধে) মুসলমানদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য গল্প প্রচলিত আছে –যেখানে বলা হয়েছে যে শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্ যীশুর পরিবর্তে তারই অনুরূপ অপর একজন (অনেকের বর্ণনা মতে ঐ লোকটি ছিলেন জুডাস)- কে সেখানে দাঁড় করান, যে যীশুর পরিবর্তে ক্রুশবিদ্ধ হয়। যাইহোক, এই গল্পগুলির কোনটির ক্ষেত্রেই আল্ কুরআন বা নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসের সামান্যতম সমর্থন পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে মুফাস্সেরদের দ্বারা যেসব গল্পের উদ্ভব হয়েছে সেসব সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। এগুলো কার্যতঃ যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন নি। কুরআনের এই বর্ণনার সাথে সুসমাচারে বর্ণিত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার গ্রাফিক বর্ণনার মধ্যে তাদের উপস্থাপিত 'সমতা বিধানের' চেষ্টাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই করে না। (যীশুর) ক্রুশবিদ্ধ হবার কাহিনীর সংক্ষিপ্ততম ব্যাখ্যা দিতে আল্ কুরআনের **'ওয়ালাকিন শুব্বিহালাহুম'** শব্দ গুচ্ছই যথেষ্ট, আমার মতে, যার অর্থ "কিন্তু তাদের নিকট এরূপই মনে হয়েছিল যেন এমনটিই ঘটে থাকবে।" এথেকে বুঝা যায় কালের ব্যবধানে এবং যীশুর সময় কালের অনেক পরে (সম্ভবতঃ তৎকালীন মিথ্রা সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রভাবে) কোন না কোনভাবে এই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে– একথা বুঝানোর জন্য যে, যে পাপের ভারে মানবজাতি ন্যুব্জ, তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। আর পরবর্তীকালের যীশু-ভক্তদের মাঝে ঐ কাহিনী এমন দৃঢ় আসন লাভ করে যে, যীশুর শত্রু ইহুদীরাও একে বিশ্বাস করতে শুরু করে– যদিও হীন ধারণার বশবর্তী হয়ে (কারণ তৎকালে হীনতম অপরাধীদের জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হবার শাস্তি নির্ধারিত ছিল)। এটিই আমার মনে হয়, **ওয়ালাকিন শুব্বিহালাহুম** শব্দগুচ্ছের একমাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। এর অধিক বলতে গেলে, শুব্বিহা বাগবৈশিষ্ট্যযুক্ত সমার্থক শব্দ খৈয়িলা'র সাথে অভিব্যক্তিপূর্ণ [একটি অবস্থা] আমার কাছে মানানসই একটি কাল্পনিক সাদৃশ্য, অর্থাৎ "আমার ধারণায়–অন্য কথায় (আমার কাছে তদসদৃশ্যই মনে হয়েছিল" (দ্রষ্টব্য কামূস, প্রসঙ্গ ' খৈয়ালা', বিস্তারিত জানার জন্য লেইন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৮৩ পৃষ্ঠা, এবং ৪র্থ খণ্ড, ১৫০০ পৃষ্ঠা)।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদূদী বলেছেন, "মসীহ্ (আঃ)–এর জীবিত থাকা এবং সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন নয় এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস জন্মে না।" (ইচ্ছারার বক্তৃতা, ২৮শে মার্চ, ১৯৫১ খ্রীঃ) তিনি আরও বলেন, "..... মসীহ্ (আঃ)– এর মৃত্যুর পর প্রথম তিনশত বৎসর পর্যন্ত খ্রীষ্টান জগত এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল....." (ফালাহ–ই–আ'ম ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'তরজমায়ে কোরআন মাজিদ,' ছুরাহ্ মায়েদা, টীকা নং ৫১, পৃষ্ঠা নং ১৯০)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–এর গবেষণা ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'র জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সংখ্যায় বলা হয়েছে, "ওহীর কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর নবীদের মৃত্যু হয়। ঈসা (আঃ)-এর একইভাবে মৃত্যু হইয়াছে"। ৩নং সুরা ৫৫ আয়াতে বলা হইয়াছে, 'স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্ বলিলেন, হে ঈসা আমি তোমার কাল (ওহী প্রচারের সময়) পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হইতে তোমাকে মুক্ত করিতেছি··· ঈসা (আঃ)-এর উফাতের পর প্রায় ৬০০ বৎসর অতীত হইয়া গেলো । তিনি যে শুভ সংবাদ দিয়া গিয়াছিলেন আহমদ নামীয় নবীর আবির্ভাবের -সেই রসূল কুলমণি... বিশ্বনবী উম্মুল কিতাব আল্ কুরআন রাখিয়া গেলেন। উপরে উদ্ধৃত সূরা 'নিসা'র ১৫৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, 'কিতাবীদিগের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেই...' বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলো যে পুঞ্জীভূত ওহী –আল্ কুরআন কিতাব ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশিত পথে সকলকে বিশ্বাস স্থাপন করিতেই হইবে। ইহা সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্ তাবারকতাআলার নির্দেশ" (পৃষ্ঠা-৬১)। বিশ্ব আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, "হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে চলে গেছেন এবং পুনরায় কোন সময়ে জমীনের দিকে ফিরে আসবেন যদি কোন ব্যক্তি এরূপ হাদীস পেশ করতে পারেন, আমরা তাঁকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করব। এতদ্ব্যতীত তওবা করব এবং সকল পুস্তক জ্বালিয়ে ফেলব। যে প্রকারে ইচ্ছা সন্দেহ মোচন করতে পারেন" (কিতাবুল বারিয়া, ১৯২ পৃষ্ঠা)। উল্লেখ্য যে, এই চ্যালেঞ্জ ১৯০৩ সাল থেকে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একে খণ্ডন করে উক্ত বিশ হাজার টাকা পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য কারও হয় নি।

'ফাতহুল বয়ান' পুস্তকের ৩য় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "হাফেয ইবনে কাইয়েম তাঁর পুস্তক 'যাদুল মা'আদ'-এ লিখেছেন, 'হযরত মসীহ্ (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তেত্রিশ বৎসর বয়সে আকাশে উত্তোলিত হয়েছেন। কিন্তু এর সমর্থন কোন মুত্তাসিল (প্রামাণিক) হাদীস বিদ্যমান নেই; যে জন্য ইহা মানা ওয়াজেব হতে পারে। শামী বলেছেন, বস্তুত ইমাম কাইয়েম যেমন বলেছেন তা-ই ঠিক। এই আকিদা হযরত রসূল (সাঃ)-এর কোন হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা খ্রীষ্টানদের রেওয়ায়াত এবং এ আকিদা তাদের নিকট থেকে এসেছে।'

যীশু খ্রীষ্টের আকাশে গমনের ধারণার উৎপত্তি সম্বন্ধে The Crucifixion By An Eye-witness-এ বলা হয়েছে:

"Then the elders of the Essen Brotherhood sent word to Jesus that they were waiting, and that it was then already late.

As the disciples knelt down, their faces bent toward the ground, Jesus rose and hastily went away through the gethering mist. When the disciples rose there stood before them two of our brethren in the white grab of our Brotherhood, and they instructed them not to wait for Jesus, as he was gone, whereupon they hastened away down the mountain (P-124)...But in the city there arose a rumor that Jesus was taken up in a cloud, and had gone to heaven. This was invented by the people who had not been present when Jesus departed. The disciples did not contradict the rumor, inasmuch as it served to strengthen their doctrine, and influenced the people who wanted a miracle in order to believe in him" (p-125) অর্থাৎঃ তখন এসীন ভাতৃসঙ্ঘের বয়স্ক সদস্যরা যীশুর কাছে খবর পাঠালেন যে, তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন এবং ইতোমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

তখন শিষ্যরা যীশুকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য হাঁটু গেড়ে মাটির দিকে মাথা নোয়ালে, যীশু তাদের সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত পায়ে ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে মিলিয়ে গেলেন। যখন শিষ্যমণ্ডলী উঠলেন, তথায় আমাদের সংস্থার ভাতৃমণ্ডলী শ্বেত-বস্ত্র পরিহিত দু'ব্যক্তি তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং যীশুর জন্য অপেক্ষা না করতে উপদেশ দিলেন, যেহেতু তিনি চলে গেছেন, যার ফলে তারা দ্রুতগতিতে পাহাড়ের নীচে চলে গেলেন।... কিন্তু শহরে এই গুজবটি ছড়িয়ে পড়ল যে, যীশুকে মেঘের ভেলায় করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। একথা তারাই আবিষ্কার করেছিল যারা যীশুর বিদায় বেলা সেখানে উপস্থিত ছিল না। শিষ্যমণ্ডলীও এই গুজবে কোন মতভেদ করেন নি এইহেতু যে, তাদের মতবাদকে জনসাধারণের

মধ্যে দৃঢ় করতে এবং তাঁর সংস্থায় বিশ্বাস করণার্থে এক অলৌকিক ক্রিয়া-দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করতে ইহা সহায়ক ছিল।"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, **"ওয়ামা জাআলনাহুম জাসাদাল লা ইয়া'কুলুনাত্ তাআমা ওমা কানূ খালিদীন,** অর্থাৎ–আর আমরা তাদের (রসূলদের) এমন দেহ সৃষ্টি করি নি যে, তারা না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের কেউ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে" (সূরা আম্বিয়াঃ ৮ম আয়াত)।

ওমা জাআলনা লি বাশারিম্ মিন কাবলিকাল্ খুলদা আফা ইম্মিত্তা ফাহুমুল খালিদূন, অর্থাৎ–আর (হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বেও কোন মানুষকেই দীর্ঘ জীবন দান করি নি; অথচ তুমি মরে যাবে আর অন্যেরা দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে (এটা কি করে সম্ভব)? (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৪ আয়াত)।

"ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন কাদ্ খালাত মিন কাবলিহির রসুল, অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল ব্যতিরেকে আর কিছু নন, তাঁর পূর্বে সব রসূল (মৃত্যু লাভ করে) গত হয়ে গেছেন (সূরা আল ইমরান, ১৪৪ আয়াত)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাধারণ মুসলমানরা সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ আয়াতে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী সকল রসূলের জন্য ব্যবহৃত 'খালাত' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু' নয়, 'গত হওয়া' বুঝে থাকেন। কিন্তু সূরা মায়িদার ৭৫ আয়াতে ব্যবহৃত অনুরূপ 'খালাত' শব্দের দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)এর পূর্ববর্তী সকল রসূলেরই মৃত্যু বুঝে থাকেন। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূর্ববর্তী রসূলসহ হযরত ঈসা (আঃ) ও 'খালাত' শব্দের দ্বারা মৃত্যু লাভ করে গত হয়ে গেছেন, এতে দ্বি-মত পোষণের অবকাশ নেই। এ সম্বন্ধে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আলোচ্য সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ আয়াতের তফসীরে বলেনঃ

"এই আয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্ববর্তী নবীরা সকলে গত হয়ে, অর্থাৎ মরে গেছেন- হয় স্বাভাবিকভাবে, না হয় অন্য কর্তৃক নিহত হয়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের গত হওয়ার মাত্র এই দু'টি পদ্ধতি আছে। এতদ্ব্যতীত তাদের তিরোধানের অন্য কোন পদ্ধতি নেই। কোরআনের নির্দেশ অনুসারে হজরত ঈসাও একজন রসূল ছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবন অবসানও এই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। তাঁর মৃত্যুর জন্য অন্য কোন সৃষ্টি ছাড়া বিশেষ নিয়ম নির্ধারিত হয়ে থাকেল এখানে সেই বর্জিত বিধির উল্লেখ নিশ্চয় করা হ'ত। পরবর্তী (১৪৫) আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দে'য়া হচ্ছে যে, মওতের একটি সময় নির্ধারিত আছে। দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের আবহমান কালের অভিজ্ঞতার ফলে, মানুষের বয়স সম্বন্ধে একটি সর্ব্বোচ্চ পরিমাণও মোটামুটিভবে অবধারিত হয়ে গেছে। কিন্তু হজরত ঈসার বয়স বর্তমানে দু'হাজার বছর অতিক্রম করে গেছে। **খালাত মিন কাবলিহির রাছুলুন** পদে রাছুলুন বলতে যে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রছুলদেরকে বুঝাচ্ছে, তাফছীরকাররাও তা স্বীকার করেছেন। (দেখুন, কবীর, এবন-জরীর, গারায়েকুল কোরআন, রুহুলমাআনী প্রভৃতি)। মরহুম মুফতী আবদুহু স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- 'হজরতের পুর্বে রসূলরা গত হয়েছেন, মরে গেছেন। তাঁদের কেউই অমর হয়ে ছিলেন না। এইই হচ্ছে আল্লাহ'র প্রবর্তিত নিয়ম। সুতরাং মোহাম্মদও যদি মরে যান, যেমন মুছা ও ঈসা মরে গেছেন, অথবা তিনি যদি নিহত হন-যেমন জাকারিয়া ও ইয়াহিয়াহ্ নিহত হয়েছিলেন, তাহলে তোমরা কি তাঁর প্রচারিত ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে?" (দেখুন, তাফছীর সহ কোরআন প্রথম খণ্ড, ৫২৫ ও ৫২৬ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কুরআনে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ আরও বহু আয়াত বিদ্যামান আছে। হাদীসেও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ রয়েছে, যেমন–

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মৃত্যু শজ্যায় হযরত ফাতিমা (রাঃ)–কে বলেছিলেন, **"আন্না ঈসা ইবনি মারিয়ামা আশা ইশরিনা মিয়াতা ওয়া ছানাতিন,** অর্থাৎ মরিয়ম পুত্র ঈসা একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন" (মা সাবাত বিল লিসানা, ১১৮ পৃষ্ঠা; কাঞ্জুল উম্মাল–৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা; মুয়াহিবি লাদ্‌দুনিয়া, কাসতালানী লিখিত, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা; এছাড়া তীবরানী, হাকিম, মুস্তাদরিক ও তাফসীরে জালালাইন–এর হাশিয়াতেও এই হাদীসটি আছে)।

হযরত রসুল করীম (সঃ) বলেছেন, **"লাও কানা মূসা ওয়া ঈসা হাইয়াইনি লামা ওয়াসিয়াহুমা ইল্লাততিবায়ী,** অর্থাৎ –মূসা ও ঈসা আজও যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ব্যতিরেকে তাদেরও গত্যন্তর থাকত না।" (ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা; এছাড়া আল্ ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির, ফাত্‌হুল বয়ান, তিবরানী ইত্যাদিতেও এই হাদীসটি আছে। উল্লেখ্য যে, জাহানে নও, ইসলামী আন্দোলন সংখ্যায়ও এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে)।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত ৩০৯ নং হাদীসে আছে যে, হযরত রসুল করীম (সঃ) মিরাজ রজনীতে দ্বিতীয় আসমানে হজরত ইয়াহিয়াহ্ (আঃ) –এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ)–কে পরলোকে পেয়েছিলেন। তাছাড়া, হযরত আলী (রাঃ) যেদিন প্রাণত্যাগ করেন, সেদিন তদীয় পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) বলেছিলেন, "তিনি সেই রাতে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন, যে রাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আত্মা পরলোক গমন করেছিলেন, অর্থাৎ ২৭শে রমযান।" (তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড)।

বিখ্যাত ইমাম ও আলেমগণও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁর সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছীর সহ কোরআন শরীফ, প্রথম খণ্ড, ৪৪১–৪৪২ পৃষ্ঠায় সুরা আল্ ইমরানের ৩৯ নং টীকায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে বিখ্যাত ইমামদের ক'টি অভিমত উদ্ধৃত করেছেনঃ

"(১) ইমাম এবন-হাজম বলেছেনঃ ...., আল্লাহ্ হজরত ঈসার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন–ঈসা বলেছিল, 'আমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম আমার জীবন কাল পর্যন্ত। কিন্তু তুমি যখন আমার মৃত্যু ঘটালে, তখন থেকে তুমিই ছিলে তাদের নেগাহ্‌বান।' ..... অতএব ইহা সঙ্গতভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে,হযরত ঈসার মৃত্যু হয়ে গেছে স্বাভাবিক মওতের দ্বারা (মোহাল্লা, ১-২৩–।"

"(২) আলেম সমাজকে ইমাম মালেকের পরিচয় দিতে হবে না। হাদীসের বিখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মোহাম্মদ তাহের বলেছেনঃ "অধিকাংশের মতে হযরত ঈসার মৃত্যু হয় নি। কিন্তু ইমাম মালেক বলেছেন, তিনি মরে গেছেন ৩৩ বৎসর বয়সে" (মাজমাউল -বেহার ১–২৮৬ পৃষ্ঠা)।

মিশরের আল্ আজহার ইউনিভার্সিটির রেক্টর আল্লামা শেখ মাহমুদ সালতুত বলেন ঃ খোদাতাআলার সকল মা'মুর মুরসাল নবী যেভাবে মারা গেছেন, মসীহ্ (আঃ)–ও ঠিক সেভাবেই মারা গেছেন" (আল্ ফতোয়া, মিশর সংস্করণ, ৫৮ পৃষ্ঠা, মুজাল্লাতুল আযহার, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০)।

যীশুখ্রীষ্টের পুনঃ আগমনের তাৎপর্য ঃ খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

নিবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে যে যীশুখ্রীষ্ট সশরীরে স্বর্গে চলে গেছেন এবং শেষ যুগে পৃথিবীতে পুনঃ আগমন করবেন। কিন্তু খ্রীষ্টানদের এই বিশ্বাসটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ইহুদীরা খ্রীষ্টানদের বহু পূর্ব থেকেই প্রচার ও বিশ্বাস করে আসছে যে, ইলিয়াস (ইয়াহিয়াহ্) নবী (আঃ) জীবিতাবস্থায় ঘূর্ণবায়ুতে আকাশে চলে গেছেন (বাইবেলঃ ২ রাজাবলী, ২ঃ১১) এবং আজও সেখানে জীবিত অবস্থান করছেন;তিনি প্রতিশ্রুত খ্রীষ্ট (যীশু)'র আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে পুনঃ আগমন করবেন। যেমন, বাইবেল বলেঃ "সদাপ্রভুর সেই মহা ও ভয়ংকর দিন আসার পূর্বে

আমি তোমাদের নিকট এলিয় নবীকে প্রেরণ করব" (মালাখি, ৪ অধ্যায়, ৫ পদ)।

অতএব, আকাশ থেকে সশরীরে নবী নেমে আসার নিয়ম মানলে নবী হযরত ইলিয়াস (আঃ) আজও আকাশ থেকে সশরীরে অবতরণ না করায় যীশু খ্রীষ্টের সত্যতা সাব্যস্ত হয় না এবং তাঁর সত্যতা সাব্যস্ত না হলে খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টান হওয়া সব্যস্ত হয় না। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণীতে যীশুখ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে হযরত ইলিয়াস নবী (আঃ)-এর আগমনের কথা রয়েছে। সুতরাং খ্রীষ্টানদের চিন্তা করে দেখা দরকার যে যীশুখ্রীষ্টকে আকাশে জীবিত কল্পনা করার বিশ্বাস তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তারা চিন্তা করে দেখে না যে, তাদের এই বিশ্বাসের মূলে তাদের ভ্রান্ত ভক্তির খোদার পুত্র যীশুখ্রীষ্টকেই অস্বীকার করতে হবে।

যীশুখ্রীষ্টের ঐতিহাসিক দর্শন ঃ
ইহুদীদের ভ্রান্তি অপনোদন

২০০০ বছর আগে, ইহুদীরা যখন ধর্মশাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশ থেকে একজন নবীর আগমন প্রতীক্ষা করছিল, ঠিক সেই সময়ে যীশুখ্রীষ্ট আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, তিনি বনী-ইস্রায়ীলের নবী –প্রতিশ্রুত মসীহ্। কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে প্রতিশ্রুত মসীহ্'র আবির্ভাবের পূর্বে আকাশ থেকে ইলিয়াস নবী (আঃ) পুনঃ আগমন করবেন। সুতরাং তিনি যেহেতু আবির্ভূত হন নি, সেহেতু যীশুর মসীহ্ হওয়ার দাবী মিথ্যা। এ সম্বন্ধে বাইবেল বলে, "শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তবে আলেমরা কেন বলে থাকেন যে, প্রথমে এলিয়ের আসা আবশ্যক? তিনি উত্তরে তাঁদের বললেন, সত্যই 'এলিয়' আসছেন ও সমস্তই 'পুনঃস্থাপন করবেন' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, এলিয় ইতোমধ্যে এসে গেছেন আর লোকে তাঁকে চিনতে পারে নি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তাই করেছে" (মথি, ১৭ঃ ১০-১২)। বস্তুত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "তিনি (প্রতিশ্রুত এলিয়) এলিয়ের আধ্যাত্মিকতা ও শক্তি নিয়ে মসীহ্'র পূর্বে আগমন করবেন" (লুক, ১ঃ১৭) "তখন শিষ্যেরা বুঝলেন যে তিনি বাপ্তিস্ম-দাতা যোহন (ইয়াহিয়াহ্ নবী'র) বিষয়ে তাদের বললেন, (মথি, ১৭ঃ১৩)। যীশু বলেন, "আর তোমরা যদি (এই দর্শন) গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে (জেনে নাও যে,) ইনিই (যোহন বা ইয়াহিয়াহ্ নবীই) সেই এলিয়, যাঁর আগমন হওয়ার কথা (ছিল)। যার কান আছে সে শুনুক" (মথি, ১১ঃ১৪-১৫)।

ফলতঃ আকাশ থেকে সশরীরে নবী নেমে আসার ধারণাকে যীশু বাজে প্রতিপন্ন করেছেন এবং তাঁর অনুগামীগণ যোহন বা ইয়াহিয়াহ্ নবী (আঃ)-কে প্রতিশ্রুত ইলিয়াস (আঃ) রূপে গ্রহণ করে হেদায়াত লাভ করেছে। কিন্তু প্রাথমিক খ্রীষ্টানরা পুরাতন কোন নবীর বেঁচে থাকা ও আকাশ থেকে তাঁর অবতরণ করার ধারণাকে বাজে প্রতিপন্ন করলেও ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে তাদের উত্তরাধিকারীরা আবার ইহুদীদের ন্যায় পুরাতন ধারণা নতুন রঙে রঞ্জিত করে স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টেরই আকাশে গমন ও আকাশ থেকে শেষ যুগে পুনঃ আগমনের বিশ্বাস পোষণ করে বিপথগামী হয়েছে। অথচ যীশু তাঁর প্রকৃত ভক্ত, শিষ্য ও অনুসারীদের কাছে সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

"পিতা (খোদা) আমারই নামে যাঁকে পাঠিয়ে দিবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদের যা বলছি সে সব স্মরণ করিয়ে দিবেন (যোহন, ১৪ঃ১৬)।

"মানব-পুত্র (তাঁর) পিতার গৌরবে ভূষিত হয়ে আপন দূতদের সহ আবির্ভূত হবেন (মথি, ১৬ঃ২৭) আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্রিত করবেন" (মথি, ২৪ঃ৩১)।

অতএব, যীশুর প্রকৃত অনুসারীদের জেনে নে'য়া উচিত যে, উপরোদ্ধৃত সুসংবাদে যীশু তাঁর নিজের আগমনের কথা বলেন নি, বরং তাঁর অনুরূপ এক মসীহ্'র আগমন সংবাদ দিয়েছেন, যাঁকে আল্লাহ্তাআলা যীশুর আধ্যাত্মিকতা ও শক্তি দিয়ে পাঠাবেন। উল্লেখ্য যে, মথি, ২৪ঃ৩১ পদে যীশু যদি নিজের আগমনের কথা বলতেন, তবে 'তিনি' স্থলে "আমি'-'তাঁর' স্থলে 'আমার' এবং 'করবেন' স্থলে 'করব' বলতেন।

মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, **"কাইফা আনতুম ইযা নাযালা ইবনু মারিয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম,** অর্থাৎ-তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন মরিয়ম-পুত্র তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে থেকেই হবেন" (হাদীস নং ৩১৯৪)।

উপরোক্ত হাদীস থেকে সাধারণ মুসলমানরা মনে করে যে হযরত ঈসা (আঃ) একদা আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে নবী করে দিতে এবং পরে শুধু একজন উম্মত হওয়ার আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন; এ কারণে ক্রুশ ঘটনার সময় আল্লাহ্তাআলা তাঁকে রক্ষা করে আকাশে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁরই পুনঃ আগমন সম্বন্ধে উদ্ধৃত হাদীসে হযরত রসূল করীম (সঃ) সংবাদ দিয়েছেন। এর স্বপক্ষে সাধারণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের ৩ঃ৫৫ এবং ৪ঃ১৫৭ আয়াতের অবতারণা করেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে –"কোরআনে ..... 'আমি আল্লাহ্ তাকে তুলে নেব' এই কথাটি আছে (৩ঃ৫৫) অন্যত্র (৪ঃ১৫৭) বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিলেন, এই উক্তি রয়েছে, কিন্তু তিনি আবার আসবেন– কোরআনে পরিষ্কারভাবে এই কথাটি নেই, তবে ৪৩ঃ৬১ আয়াত থেকে অনেকে নেমে আসা মূলক ধারণার অনুমান করেন।"

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "সেই সময়, যখন আল্লাহ্ বলেছিলেন 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব এবং তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব এবং যারা অস্বীকার করে তাদের (দোষারোপ) থেকে তোমাকে পবিত্র করব এবং যারা অস্বীকার করে তাদের উপর তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রাধান্য দান করব, অতঃপর তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমার পানে, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফায়সালা করব, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে" (সূরা আলে ইমরান, ৫৫ আয়াত)

"এবং (ইহুদীদের দাবী) 'আমরা আল্লাহ্র রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ্কে হত্যা করেছি;' অথচ তারা তাঁকে হত্যা করেনি; ক্রুশে বিদ্ধ করেও নিহত করে নি; কিন্তু তাদের নিকট তদ্রূপই (ক্রুশে বিদ্ধ মৃতের অনুরূপই) করা হয়েছিল; আর নিশ্চয় যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করে তারা সন্দেহে অভিভূত; এ সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই– আছে শুধু অনুমানের অনুসরণ এবং তারা তাঁকে নিশ্চিত হত্যা করতে পারে নি। বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন; বস্তুত আল্লাহ্ হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন্ নিসা, ১৫৭-১৫৮ আয়াত)।

উপরোদ্ধৃত আয়াতের তফসীরে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেনঃ"কোরআনের ভাষা ও শব্দ বিন্যাস অনুসারে, আয়াতের তাৎপর্য হবে ইহুদীরা যখন ঈসাকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল– 'সেই সময় আল্লাহ্ বলেছিলেন, হে ঈসা! ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্রকে আমি ব্যর্থ করে দিব! তোমাকে তারা ক্রুশে দিয়ে মারতে এবং সেমতে তোমাকে (বাইবেল অনুসারে) মাল্উন বা অভিশপ্ত বলে প্রচার করতে পারবে না, অথবা অন্য প্রকারেও কতল করতে পারবে না। বরং তোমার নবুয়তের 'মিশন' পুরা হওয়ার পর আল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবে তোমার মৃত্যু ঘটাবেন এবং নিজ সন্নিধানে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ইত্যাদি (পৃঃ ৪৩৯)।

"ইমাম এবন- হাজম বলছেনঃ ... . হজরত ঈসা নিহত হননি এবং ক্রুশে দিয়েও তাঁকে নিহত করা হয়নি। পরন্ত আল্লাহ্ তাঁর মওত ঘটিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন নিজের পানে। আল্লাহ বলছেন–

"ইহুদীরা হজরত ঈসাকে কতলও করে নাই, অথবা শূলে দিয়েও মারে নাই।" আল্লাহ্ ঈসাকে সম্বোধন করে বলছেন– "আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব এবং তোমাকে তুলে নিব নিজের পানে।" (পৃঃ ৪৪২)।

" এই হিসেবে আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, হজরত ঈসার বিরুদ্ধে যখন ইহুদীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আরম্ভ করে দেয় এবং লোকচক্ষে হেয় ও ঝুটা নবী প্রতিপন্ন করার জন্য, তাঁকে হত্যা করে ফেলতে, এবং সম্ভব হলে, ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছিল, সেই সময় আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন- হে ঈসা! নিশ্চিন্ত থাক, এই অধর্মীর দল কোন প্রকারেই তোমার প্রাণ বধ করতে পারবে না। অন্যান্য নবী–রসুলের ন্যায় তোমারও স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হবে এবং তুমিও তাদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার মাকামে উন্নীত হবে" (পৃঃ ৪৪৩)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'কুরআন মজীদ'-এ আলোচ্য আয়াতের সংক্ষিপ্ত টীকায় বলা হয়েছে, আয়াত ঘোষণা করছে যে, "ঈসা (আঃ) আল্লাহ্তাআলার নিকট আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চস্তরে সম্মানিত আসনে সমাসীন আছেন। এ আয়াতের কোথাও ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে উঠার কোন কথা নেই। এই আয়াত শুধু এ কথাই বলছে যে, আল্লাহ্ তাকে নিজের পানে (সন্নিধানে) সম্মানিত করেছেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আল্লাহ্'র কাছে উন্নীত করার অর্থ কোন নির্দিষ্ট জাগতিক স্থানে নিয়ে যাওয়া বুঝাতে পারে না, কারণ আল্লাহ'র জন্য কোন বাসস্থান নির্ধারণ করা যায় না।"

মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব বলেন, ".... ..... আল্লাহ্ হজরত ঈসাকে উন্নীত করবেন (তাঁর পানে) এই-ই হচ্ছে আয়াতের অনুবাদ। কিন্তু আরব সমাজে প্রচলিত সংস্কারের মোহ কাটাতে না পেরে, অনেকে 'রাফউন'-এর মতলব নিচ্ছেন- আল্লাহ্ হজরত ঈসাকে "জীবন্ত অবস্থায়" তুলে নিবেন তাঁর পানে-অর্থাৎ "চৌথা আসমানে।" তাঁরা বলছেন, এই ওয়াদা অনুসারে আল্লাহ্ তাঁকে দু'হাজার বৎসর পূর্বে আসমানে তুলে নিয়েছেন। এখন তিনি ফেরেশতাদের সাথে মিশে আরশের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। .... তারা ধারণা করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ্র অবস্থানস্থল হচ্ছে আসমান। আল্লাহ্ যখন নিজের "পানে" তাঁকে তুলে নিয়েছেন, তখন আসমান নামক স্থানে গমন ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর থাকতে পারে না। এই উক্তির উল্লেখ করে ইমাম রাজী বলছেনঃ মোশাববেহা বা আল্লাহ্র আকারবাদীরা বলে থাকে যে, আল্লাহ্ আসমানে অবস্থান করে থাকে। এই আয়াতকে তারা নিজেদের দাবীর প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে থাকে। কিন্তু আমরা এই কেতাবের বিভিন্ন স্থানে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে প্রতিপন্ন করেছি যে, আল্লাহ্ অনন্ত অসীম, স্থান কাল ও দিকে তিনি সীমাবদ্ধ হতে পারেন না। ".... আমার পানে" –শব্দ দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। একদা হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন ..... আমি যাত্রা করছি আমার "প্রভুর পানে"- (সুরা ছাফফাত)। অথচ তিনি যাচ্ছিলেন ইরাক থেকে সিরিয়ার দিকে। ফলতঃ আলোচ্য শব্দের অর্থ হবে- তোমাকে আমার নির্ধারিত ..... উচ্চ মর্যাদার মাকামে উন্নীত করব (কবীর, ২-৬৯০)।

অন্য পক্ষের প্রথম প্রমাণ হচ্ছে-মে'রাজের হাদীস। এই হাদীসের সারমর্ম এই যে, হজরত রসুল করীম (সঃ) মে'রাজের রাতে দোছরা আসমানে হজরত ঈসার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেখানে তারা পরস্পরকে অভিবাদন ও প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন, ইত্যাদি। এর দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, হজরত ঈসা জীবন্ত অবস্থায় (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) আসমানে উঠে গিয়েছিলেন এবং সেই জীবন্ত অবস্থায় আজও সেখানে অবস্থান করছেন।"

মে'রাজ সম্বন্ধে .... ওই হাদিসগুলোর বর্ণনানুসারে, মেরাজের রাতে রসুলে করীম (সাঃ) হজরত ঈসা ব্যতীত আরও বহু নবীর সাথে সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করেছিলেন। আদম, ইব্রাহিম, মুসা, ইউসুফ, ইয়াহিয়াহ্ প্রমুখ আম্বিয়ার সাথে মোলাকাতের বিবরণও ঐসব হাদিসেই মওজুদ আছে। সুতরাং তাদের এই যুক্তি ও এই প্রমাণ অনুসারে স্বীকার করতে হবে যে, অন্য কোনও নবীরই এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়নি, তাঁরা সকলে জীবন্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠে গেছেন এবং সেইভাবে আজও আসমানে অবস্থান করছেন।" (তফসীরুল কোরআন পৃঃ ৪৪৩-৪৪৫)।

প্রকৃতপক্ষে বুখারী শরীফে বর্ণিত 'মরিয়ম-পুত্র তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন' সংক্রান্ত হাদীসে হযরত রসুল করীম (সঃ) বনী-ইস্রায়ীলের নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনঃ আগমনের কথা বলেন নি, বরং তাঁর অনুরূপ একজন 'মসীলে'র আগমন সংবাদ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, হযরত রাসুল করীম (সঃ) যদি স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনঃ আগমনের সংবাদ দিতেন, তাহলে 'নুযূল' শব্দের পরিবর্তে 'রুজু' শব্দের প্রয়োগ করতেন। কারণ, যে ব্যক্তি পুনঃ আগমন করে তাকে আরবী ভাষায় 'রাজি' (পুনঃ আগমনকারী) বলে। তাছাড়া, পবিত্র কুরআনে হযরত রাসূল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে এবং চলতি সহীহ মুসলিমে দাজ্জাল সম্বন্ধে 'নুযূল" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং চলতি কথাবর্তায় এই শব্দ মুসাফিরদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং মুসাফিরদের 'নাযিল' বলা হয় যে কোন স্থানে বিরাম করে তখন অনর্থক 'নুযূল' বা নাযালা শব্দ থেকে আকাশ থেকে 'আগমনক' বুঝে নেওয়া নিতান্তই অবুঝের কথা। মহাকবি আল্লামা ইকবাল তাঁর আরমুগান-ই-হিজাজ গ্রন্থে 'ইবলিস কী মজলিস-ই-শূরা' কাব্যে বলেনঃ

" যে মহাপুরুষ আসিবেন তিনি খ্রীষ্ট ঈসা, না অন্য জন?
'মুজাদ্দিদ তিনি? –যাতে রয়েছে ঈসার গুণের সকল ধন?"

প্রকৃত কথা হচ্ছে, হযরত রসূল করীম (সঃ) শেষ যুগে যে ইব্নে মরিয়ম বা মরিয়ম পুত্রের আগমন সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বনী-ইস্রায়ীলের নবী হযরত ঈসা (আঃ) নন, বরং ভিন্ন ব্যক্তি– একথা বুখারী শরীফে বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকেই বুঝা যায়। হযরত রসূল করীম (সঃ) যখন মি'রাজের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)– কে দেখিয়েছিলেন তখন তাঁর গায়ের রং লাল, মাথার চুল কোঁকরান ও প্রশস্ত বুক দেখিছিলেন। কিন্ত যখন স্বপ্নে প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-কে দাজ্জালের বিপক্ষে কা'বা তাওয়াফ করতে দেখেছিলেন, তখন তাঁর গায়ের রং বাদামী ও মাথার চুল সোজা দেখেছিলেন। যেমন, বনী-ইস্রায়ীলের ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার মি'রাজের রাতে আমি ..... নবী 'ঈসা (আঃ)–এরও সাক্ষাত পেয়েছি। অতঃপর নবী (সঃ) তাঁর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ-বিশিষ্ট" (হাদীস নং ৩১৮৩)।

"ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ (মি'রাজ রজনীতে) আমি 'ঈসা, মুসা ও ইব্রাহিম (আঃ)-কে দেখেছি। 'ঈসা (আঃ) লাল বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত বক্ষ–বিশিষ্ট লোক ছিলেন...." (হাদীস নং ৩১৮৪)।

প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছেঃ "আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) ..... বললেন ..... আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বার কাছে দেখতে পেলাম। তখন (সেখানে) বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তোমরা যেমন সুন্দর বর্ণের বাদামী রঙের মানুষ দেখে থাক, তার চেয়েও অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার সোজা চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। ..... মাথা থেকে পানি ফোটা ফোঁটা পড়ছিল। দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে তিনি কা'বা (শরীফ) তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, ইনি (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ ইবনে মরিয়ম " (হাদীস নং ৩১৮৫)।

"সালেম (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্'র কসম, নবী (সঃ) ..... বলেছেন, একদিন স্বপ্নে কা'বার তাওয়াফ করছিলাম, তখন দেখলাম এক ব্যক্তি বাদামী রঙ বিশিষ্ট খাড়া চুলওয়ালা। দু'জন লোকের মাঝে তিনি চলছেন। ..... আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তাঁরা

বলল, ইনি মরিয়মের পুত্র" (হাদীস নং ৩১৮৬)। চেহারার মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "..... যখন তোমরা তাঁকে (প্রতিশ্রুত ঈসাকে) দেখবে, তখন তোমরা তাঁকে চিনে নিও; তিনি মধ্যমাকৃতির পুরুষ হবেন। রঙ হবে লালাভ সাদা বর্ণের (অর্থাৎ গন্দমী রঙ বিশিষ্ট হবেন) ....." (আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড)।

ঈসা (আঃ)- এর আগমন সম্বন্ধে ইমাম সিরাজ উদ্দীন বলেন, "নুযূলে ঈসা (আঃ) দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আগমন বুঝায় যিনি কল্যাণ ও প্রকৃতিগত কারণে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুরূপ হবেন।" (খরিদাতুল আজায়েব ও ফরিদাতুল আগারেব, ২১৪ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইকবাল বলেন, ".... ..... হজরত ঈসা (আঃ) একজন মরণশীল মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের অর্থ রূহানীভাবে তাঁর মসীল বা সদৃশ আসবেন, অনেকটা যুক্তি সঙ্গত" (দৈনিক আজাদ, লাহোর, ৬ এপ্রিল, ১৯০৯)।

তফসীর কাশ্‌শাফ আছে, "মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম বলতে মরিয়ম ও ঈসার সিফত (গুণ) প্রাপ্ত লোককে বুঝায়।" (জিলদ-১, পৃষ্ঠা-৩১২)।

বিখ্যাত ধর্মীয় পুস্তক 'একতেবাসূল আদওয়ার, ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "আওলিয়া ও সুফীদের এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর (আধাত্মিক গুণাবলী ও সৌন্দর্যরাশি) মাহ্‌দী (আঃ)-এর মধ্যে প্রতিবিম্বাকারে প্রকাশিত হবে। ঈসা (আঃ)-এর নাযিল হওয়ার অর্থ হলো উক্ত রূপে বুরুয (আত্মিক প্রতিবিম্ব) হওয়া। ইহা **'লাল্ মাহ্‌দীউ ইল্লা ঈসা'** (ঈসা ব্যতীত মাহ্‌দী নাই)- হাদিস মোতাবেক সাব্যস্ত।"

ইকমালুদ্দীন ও বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে আছে, **"আল্ মাহ্‌দী আশবাহুন্নাছা বি ঈসাবনি মারিয়ামা খালকান ওয়া খুলকান,** অর্থাৎ- প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভাবে ঈসা ইবনে মরিয়মের মত হবেন।"

বস্তুত নবী করীম (সাঃ) শেষ যুগে যে ঈসা (আঃ)-এর আগমন সংবাদ দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি বনী-ইসরাইলের নবী হযরত ঈসা (আঃ) নন, বরং তাঁরই সিফতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। তাই হাদীসে বলা হয়েছে; **ইউশিকু মান আশা মিনকুম আন ইয়ালকা ঈসা ইবনা মারিয়ামা হাকামান আদলান ইমামান মাহদীয়ান,** অর্থাৎ-তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তাঁরা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মরূপী ইমাম মাহ্‌দীকে ন্যায়-বিচারক মিমাংসাকারী রূপে" (আহমদ বিন হাম্বল)। ইবনে মাজাহ্'র হাদিস গ্রন্থে আছে, **"লাল মাহ্‌দীউ ইল্লা ঈসা ইবনি মারয়ামা,** অর্থাৎ- ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে আর কোন মাহ্‌দী নেই।' (বাবশিদ্দাতুজ জামান)। পক্ষান্তরে, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী ভিন্ন ব্যক্তি। তারা উভয়ে একই সময়ে আবির্ভূত হবেন এবং একযোগে তরবারী যুদ্ধ করে কাফের বধ করবেন। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কারণ, রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, **"কাইফা তাহ্‌লিকু উম্মাতুন আনা আওয়ালুহা ওয়াল মাহ্‌দীয়ু ওয়াসাতুহা ওয়াল মাসীহু আখিরুহা,** অর্থাৎ- কেমন করে ধ্বংস হবে সেই উম্মত যার প্রথম ভাগে আমি, মধ্যভাগে মাহ্‌দী এবং শেষভাগে মসীহ্ থাকবেন" (মিশকাত)। -এই হাদীসে মহানবী (সঃ) এই উম্মতের যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং বলেছেন যে, এই উম্মতের প্রথম ভাগে তিনি স্বয়ং, মধ্যভাগে মাহ্‌দী এবং শেষভাগে মসীহ্ থাকবেন। অতএব, যারা মনে করেন যে 'শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্'র সময়ে একজন স্বতন্ত্র মাহ্‌দীও হবেন, তারা ভুল বলেন। প্রকৃত সত্য এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী একজনেরই দুই পদবী।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাহ্‌দী শব্দের অভিধানিক অর্থ হেদায়াত-প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর ইসলামিক পরিভাষায় মাহ্‌দী বলতে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকেই বুঝায়, যিনি আল্লাহ্'র তরফ থেকে হেদায়েত-প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। আর হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সংক্রান্ত হাদীস সংকলিত হলেও হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলির প্রত্যেকটিই মুহাক্কেকীনদের মতে যয়ীফ বলে তা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এ গৃহীত হয় নি, অর্থাৎ মাহ্‌দী (আঃ)-এর আসল উপাধি ঈসা ইবনে মরিয়ম ভিন্ন মাহ্‌দী (আঃ) সম্বোধিত পৃথক কোন হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম পরিবেশন করেন নি।

মাহ্‌দী (আঃ)-এর নাম 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' রাখার কারণ

মহানবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "নিশ্চয় এই উম্মতের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন তারা ইহুদীদের সাথে একান্ত নিকট সাদৃশ লাভ করবে এবং ইহুদীরা যা যা করেছিল তৎসমুদয়ই তারা করে দেখাবে, এমনকি ইহুদীরা যদি ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তারাও তা করবে।"

জগতের ইতিহাসে মুসায়ী শরীয়তধারী ইহুদীরা সর্বপ্রথম অযুক্তির ধারায় আকাশ থেকে একজন নবীর আগমন প্রতীক্ষা করে (ইতঃপূর্ব আলোচনা দ্রষ্টব্য)! কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হয়ে বিষয়টিকে বাজে প্রতিপন্ন করেন এবং বলেন যে হযরত ইয়াহিয়াহ্ (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনিই প্রতিশ্রুত ইলিয়াস ছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁর এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারে নি, কারণ আকাশ থেকে যে নবীর আগমনের কথা, তিনি না এসে অপর একজন তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এটা কেমন কথা? বস্তুত হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর নবুওয়তের সাক্ষীরূপে আকাশ থেকে একজন নবীকে নামিয়ে আনতে পারেন নি বরং আকাশ থেকে নবী নেমে আসার ধারণাকে বাজে প্রতিপন্ন করেছেন বলে তাঁর স্বজাতি ইহুদীরা তাঁকে প্রতারক ধারণা করে তাঁর নবুওয়তের দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং আজও তারা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মিলে প্রত্যেক শনিবার বয়তুল মোকাদ্দসের ক্রন্দন দেওয়ালের নিকট আল্লাহ্‌তাআলার কাছে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে আকাশ থেকে প্রেরণ করার জন্য সকাতরে প্রার্থনা জানিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, প্রতিশ্রুত নবী হযরত ইলিয়াস (আঃ) আজও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন না, অথচ তাদেরই একদল (প্রাথমিক খ্রীষ্টানরা) হযরত ইয়াহিয়াহ্ (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ)রূপে গ্রহণ করে হেদায়াত লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনে পুরাতন কোন নবীর বেঁচে থাকা ও আকাশ থেকে তাঁর অবতরণের অসারতা প্রতিপন্ন করলেও ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে তাদেরই পরবর্তীরা পুনরায় ইহুদীদের ন্যায় পুরাতন ধারণা নতুন রঙে রঞ্জিত করে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে গমন ও আকাশ থেকে শেষ যুগে আগমনের বিশ্বাস পোষণ করে বিপথগামী হয়েছে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করার মূলে রয়েছে আকাশ থেকে কোন নবীর আগমনের অস্বীকার। মুসলমানদেরও ইহুদীদের অনুকরণ করার আশংকা ছিল (আলোচ্য হাদীস দ্রষ্টব্য), তাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে সকল নবীর মৃত্যু সম্বন্ধে সকল সাহাবাদের একমত হতে দেখেও (বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস) আবার একদল মুসলমান আকাশ থেকে একজন পুরাতন নবীর আগমন চায়। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, ইহা করতে হ'লে তাদেরকে ইহুদীদের মীমাংসা গ্রহণ করতে হবে এবং এত এগিয়ে না এসে অনেকখানি পিছিয়ে ইহুদীদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতে হবে। আকাশ থেকে সশরীরে নবী নেমে আসার নিয়ম মানলে নবী হযরত ইলিয়াস (আঃ) আজও আকাশ থেকে সশরীরে অবতরণ না করায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাবী নস্যাৎ হয়ে যায় এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন না হয়ে থাকলে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আগমন সাব্যস্ত হয় না এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতা সাব্যস্ত না হলে তাদের মুসলমান হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের কথা এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর

আগমনের কথা।

সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা ও আগমনের কথা সত্য হলে মুসলমানদের বিশ্বাস ও যুক্তি-মূলে ইহুদী ধর্মই আজ সচল এবং তাদের ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং শেষ যুগের মুসলমানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রদত্ত হুবহু ইহুদী আখ্যাই তাদের জন্য উপযুক্ত। এখন চিন্তা করে দেখা দরকার, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে জীবিত কল্পনা করার বিশ্বাস মুসলমানদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে; এটা করতে হ'লে তাদেরকে তাদের ভ্রান্ত ভক্তির আল্লাহ্'র কুদরত হযরত ঈসা (আঃ)-কে ও স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কেও অস্বীকার করতে হবে। এজন্য আল্লাহ্তাআলা মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই সূরাহ্ ফাতিহায় "আমাদেরকে বিপথগামী (খ্রীষ্টান)-দের পথে চালিয়ো না" প্রার্থনা শিখিয়েছেন। কিন্তু এরূপ প্রার্থনা করা সত্ত্বেও যুক্তিকে হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার দোষে তারাও ইহুদী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। এর হাত থেকে খ্রীষ্টানরাও রেহাই পায় নি এবং মুসলমান জাতির মধ্যেও একদল এ ব্যধির আক্রমণে পীড়িত। এ ব্যাধির চিকিৎসা অতীতে যে ঔষধ দ্বারা হয়েছিল, মুসলমানদের জন্যও সেই ঔষধেরই প্রয়োজন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতা ছিল ইহুদী ব্যাধির ঔষধ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সেজন্য শেষ যুগের ইহুদী সদৃশ্য মুসলমানদের উদ্ধারকর্তা প্রতিশ্রুত মসীহ্-হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর রূপক বা আধ্যাত্মিক নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম রেখেছেন। যেরূপ শেষ যুগের ইহুদী সদৃশ্য ভ্রান্ত মুসলমানরা প্রকৃত পুরাতন ইহুদী নয়, সেইরূপ শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-ও পুরাতন বনী-ইস্রায়ীলের ঈসা (আঃ) নন। বিগত ঈসা (আঃ) ইঞ্জিল ও কুরআনের কথা অনুযায়ী মাত্র বনী-ইস্রায়ীলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের জন্য নবী বা ইমাম হতে পারেন না। অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন যে, একদা হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্তাআলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের একজন উম্মত বানিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্তাআলা তার সেই প্রার্থনা কবুল করেছিলেন বলে তাঁকে দীর্ঘজীবী করে সশরীরে আকাশে তুলে নিয়েছেন এবং শেষ যুগে-(কিয়ামতের পূর্বে) শরীয়তে মুহাম্মদীর একজন অনুসারী হিসেবে পুনঃ দুনিয়ায় প্রেরণ করবেন। -এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত ঈসা (আঃ) যে শরীয়তের নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন সেই শরীয়তের বাহক হযরত মূসা (আঃ) একদা আল্লাহ্তাআলার নিকট মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের একজন নবী হতে এবং পরে শুধুমাত্র একজন উম্মত হওয়ার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা তাঁর সেই আবেদনের সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে প্রত্যাখান করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ইমাম সুয়তী (রহঃ) প্রণীত 'আল্খাসায়েসুল কুবরা' প্রথম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা এবং মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) প্রণীত 'নশরুত্ তীব ফি যিকরিন্নাবিয়্যীন হাবীব (সঃ) পুস্তকের ১৯৩ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আলহাজ মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব কর্তৃক অনূদিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করে দিচ্ছিঃ "হজরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক একবার মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন ঃ তুমি বনি-ইসলাইলদের জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আহ্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন, আহ্মদ কে? আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন হে মূসা! আমার ইযযত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টি-জগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকেই সৃষ্টি করিনি! আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও যমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইযযত ও গৌরবের শপথ আমার সমস্ত মাখ্লুকের জন্য জান্নাত হারাম, যতক্ষণ মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। মূসা (আঃ) পুনরায় আরয করলেন ঃ আমাকে সেই নবীর একজন উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ তুমি তার পুর্বেই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছ আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবে। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেবো।" (দেখুন, যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ১৮৪ পৃষ্ঠা; আল বালাগ পাবলিকেশন ঢাকা এবং এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা। এছাড়া, মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মুহাম্মদ শফী (করাচী) লিখিত খত্মে নবুওয়াত ৩৪৫ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হাদীস নং ১২০ দ্রষ্টব্য)।

অতএব, আল্লাহ্তাআলা ইহা সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হযরত মুহম্মাদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের পর তাঁর উম্মতের বাইরের কেউ তাঁর উম্মতের জন্য নবী হতে পারবে না এবং তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী তার উম্মতও হতে পারবে না। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) যদি কখনও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একজন উম্মত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে আল্লাহ্তাআলার নিকট প্রার্থনা করেও থাকেন, তাহলে যে তা কবুল হয় নি- উপরোদ্ধৃত হাদীস থেকে তা সপ্রমাণিত হচ্ছে।

বস্তুত আল্লাহ্তাআলা শেষ যুগের ইহুদী সদৃশ্য মুসলমানদের জন্য নতুন ঈসা (আঃ)-এর প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন এবং আখেরী জামানার ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান-এই তিন জাতির আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময় ও সংশোধনের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম অভিব্যক্তি করেছেন ঃ

ইহুদীদের জন্য এই উদ্দেশ্যে যে, অতীতে একবার তাদের চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই সত্য পন্থাতেই ভবিষ্যতেও আবার নতুন করে তাদের পুরাতন ব্যাধির প্রতিষেধকের পুরাতন নাম দিয়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতদ্দ্বারা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যাঁকে তারা ক্রুশবিদ্ধ করছিল, তিনি সত্যিই তাদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ ছিলেন। কিন্তু ক্রুশে তাঁকে হত্যা করতে পারে নি।

খ্রীষ্টানদের জন্য এই উদ্দেশ্যে যে, এ নামেই যাঁকে তারা উদ্ধারকর্তা মেনে ইহুদীদেরকে যে যুক্তিতে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছিল, সে নামেই পুরাতন ধারায় ভবিষ্যতে আবার তাদের প্রত্যাশিত এক নতুন উদ্ধারকর্তা আসবেন।

মুসলমানদের জন্য এই উদ্দেশ্যে যে, ইহুদীদের সর্বতোমুখী অধঃপতনে যে ব্যবস্থার দ্বারা তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মুসলমানরা ভবিষ্যতে ইহুদীদের দশা প্রাপ্ত হ'লে সেই পুরাতন নামেই তাদের নতুন ব্যাধির নতুন করে চিকিৎসা করা হবে।

বস্তুত ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান-এই তিন জাতির আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যে মহাপুরুষের আগমনের কথা সেই বিশ্ব প্রতীক্ষিত মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক নাম 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

গ্রন্থনা ঃ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ।

ভুল সংশোধন ঃ

[এই নিবন্ধের পূর্ব প্রকাশিত অংশের শেষাংশে (৫২পৃষ্ঠায়) অসাবধানতাবশতঃ the phrase 'walakin shubbiha lahum' -এর পর the more so as the expression shubbiha' is idiomatically synonymous, with কথাটুকু বাদ পড়েছে, এজন্য আমরা দুঃখিত।]

সময়ের কি অপব্যয় ব্যক্তিত্বের কি অপচয়

সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিতে বিচার-বিবেচনা করে গত কয়েক বছরে হযরত ঈসা (সঃ)-এর আকাশে দীর্ঘ দু'হাজার বছর জীবিত থাকা সম্পর্কে মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে যা সমাধানের কোন সন্ধান খুঁজে পাচ্ছি না। তাই পাক্ষিক আহমদীর পাঠক-পাঠিকা ভাই - বোনদের কাছে ওসব তুলে ধরছি। কেউ সমাধান জানালে তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। জাগতিক জীবনে আমরা দেখতে পাই সমাজে যে যত উচ্চ স্তরে থাকেন ও মর্যদায় ভূষিত হন তার সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য তত বেশী হয়। বিভিন্ন সমাজ ও দেশে এই স্বীকৃতি অযথা নয়। এতে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সুষ্ঠু ও কার্যকর মিলন ঘটে। কিছু উদাহরণ নেয়া যাক। একজন হেডমাষ্টারের সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব তাঁর সহশিক্ষকগণ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের চেয়ে অধিক। দেশের রাষ্ট্রপতির সময়ের মূল্য সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে গুণে মানে অনেক বেশী। তাই রাষ্ট্রপতির সাথে যখন তখন যে সে দেখা করতে পারে না। এসব বিবেচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, কোন নবীর সময় সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা তিনি মানুষ এবং একই সময়ে তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন। হযরত ঈসা (আঃ) ও এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই এই দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন। প্রশ্ন জাগে তিনি আকাশে এই মহান দায়িত্ব কীভাবে পালন করছেন? একজন নবী যদি দুই হাজার বছর সরাসরি মানুষকে হেদায়াত করতেন তবে দুনিয়াবাসী কত যে উপকৃত হ'তো তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি আকাশে থেকে কি এর সামান্য অংশও করতে পারছেন? বরং দুনিয়ার লোক তাঁকে নিয়ে বহু সমস্যায় পড়েছেন। কথা বলার সামর্থ্য তথা ভাষার অধিকারী হওয়ায় মানব জীবন মনোভাবে ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়েছে। আকাশে সে ব্যবস্থাদি থাকার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? যদি থেকে থাকে তবে খুবই ভাল। নতুবা তিনি তো বোবা জীবন যাপন করছেন। আরো একটি বড় প্রশ্ন হলো, সেখানে তিনি কর্মময়, না কর্মহীন দিন কাটাচ্ছেন? কর্মময় হয়ে থাকলে, ওসব কী ধরনের কাজ-কর্ম? কর্মহীন হয়ে থাকলে তা কি কোন লোকের বিশেষ করে কোন নবীর জন্য শোভন ও কাম্য হ'তে পারে?

বহুল প্রচারিত একটি কথা বলা হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত হওয়ার খায়েশ প্রকাশ করায় তাঁকে মৃত্যু না দিয়ে আকাশে তুলে রাখা হয়েছে। এতে প্রশ্ন জাগে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হুযূর (সঃ)-এর জীবিত কালে পাঠালে তাতো অনেক হৃদয়গ্রাহী হতো এবং তাতে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যেতো। তা না করার কারণ সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে। বিভিন্ন ধর্ম এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন নিয়ে বাক-বিতন্ডা, ঝগড়া-ফাসাদ এমনকি হানাহানি হচ্ছে। এসবের সমাধানের জন্য তাঁর শুভ পুনরাগমনই সমাধান করতে পারে। সেটা হচ্ছে না কেন?

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কবিতা

আবার আসিব যবে

আবার আসিব যবে বিপাশা নদীর তীরে
এই কাদিয়ানে
যুগের মাহদীর স্মৃতি বিজারিত স্বর্গ সুখের
দারুল আমানে
শতবর্ষ আগের ওহী-ইলহামের দূত সেই
অশরীরী ফিরিশ্‌তাগণ
মসীহ মাওউদের চার দেয়ালের মাঝে যেন
রহমতের বারি করিছে বর্ষণ
শীতের গভীর রাতে যিক্‌রে ইলাহীর সাথে
চলে যাব মসজিদে আকসায়
মন-প্রাণ-ধ্যান সবই বিলিয়ে দিব জীবন্ত
খোদাকে পাবার আশায়
তাহাজ্জদ নামাযের ইমাম সাহেবের
সুমধুর সুরের ব্যঞ্জনা
বিগলিত চিত্তে হৃদয় নিংড়ায়ে জুড়াব
মনের সকল বাসনা
খোদা-প্রেমের প্রেমকুঞ্জ বায়তুদ্ দোয়ার
মিলন মেলার স্থানে
শরাব পানে বিভোর হইয়া পড়ে র'ব তাঁর
প্রেমস্পর্শের টানে
শিশির ভেজা প্রভাতে জন স্রোতের সাথে আমিও
যাব সেই স্বর্গোদ্যানে
খোদার দরবারে মিনতি করিব মন-দেহ মোর
সমাহিত হয় যেন এই স্থানে
জলসাগাহের জনসমুদ্রের মাঝে নীরবে বসিয়া
আমি করিব শ্রবণ
বিশ্ব-শান্তির মিলন কেন্দ্র খোদা কাদিয়ানেই
করিয়াছেন স্থাপন
কত বিদেশীর সাথে পরিচিত হ'তে মনের ভাব
বিনিময়ে হব ব্যাকুল
মোরা মসীহ্ মাওউদের রোপিত বাগানের
এক বৃন্তের অনেক ফুল
সেবাব্রতীগণের আতিথেয়তা লংগর খানার খাবারের
কথা যায় নাকো কভু ভোলা
স্বদেশী স্বজনীদের লাগিয়া ইলহামী আংগুটি কিনিব
যাচাই করিয়া মেলা
অলিতে গলিতে পুণ্য কুঠরীতে যেখানে যত
আছে ঐশী নিদর্শন
দোয়ার সম্রাটের দোয়া ছোঁয়ার লাগিয়া
সদাই করিব বিচরণ
মন ভুলানো প্রাণ জুড়ানো অনাবিল প্রশান্তির
অফুরন্ত রহমতের ভান্ডারে
তোমার আশীষ লাভে আবার আসিতে খোদা
তৌফীক দিও মোরে।

- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা

চৌধুরী হামীদুল্লাহ্,
ওয়াকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ

[আহমদী জামাতে খেলাফতের পরে মজলিসে শূরা খুবই গুরুত্ব বহন করে। "খেলাফত ও শূরা ... এ দুটোর মধ্যে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার প্রাণ নিহিত।"

আগামী কয়েক মাস সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিখিল বিশ্ব আহমদী জামাতের মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকবে। শূরার তাৎপর্য, উহার নিয়ম-কানুন, উহার পদ্ধতি ও সম্মান আর উহার উচ্চ ইসলামী ঐতিহ্যসমূহ এবং শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের কর্তব্যসমূহ প্রভৃতি বহু এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ব্যাপারে মোকাররম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব, ওয়াকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ কুরআন মজীদ, হযরত নবী করীম (সঃ)-এর হাদীসসমূহ, হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর খলীফাগণের (রাঃ) পবিত্র দৃষ্টান্ত ও তাঁদের নির্দেশাবলী ও পথ-নির্দেশনা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ প্রবন্ধ সংকলন করেছেন। আমরা জামাতের বন্ধুগণের উপকারার্থে ইহা আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছি।

আমরা আশা করি, জামাতের বন্ধুগণ এবং বিশেষ করে কর্মকর্তাবৃন্দ ও শূরার প্রতিনিধিবৃন্দ কেবল পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েই এসব নির্দেশাবলী ও পথ-নির্দেশনা পাঠ করবেন না বরং তারা এগুলোকে তাদের অন্তরে স্থান দিবেন আর সর্বদা নিষ্ঠার সাথে এগুলোর ওপরে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালবেন। ওয়া বিল্লাহিত্তাওফীকি - আর সামর্থ্য দানের মালিক তো আল্লাহ্ই- সম্পাদক]

কুরআন করীম ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শকে একটি নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছে। যেভাবে বলেছেন ঃ

১। **ওয়া আমরুহুম শূরা বায়নাহুম** - অর্থাৎ এর পদ্ধতি এই যে, নিজেদের প্রত্যেক কাজ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সাধন করো (সূরাতুশ্ শূরা ঃ ৩৯)।

২। **ফা বিমা রহ্মাতিম্মিনাল্লাহি লিন্‌তা লাহুম - ওয়া লাও কুনতা ফায্‌যান গালীযাল কল্‌বি লান ফায্‌যূ মিন হাওলিক - ফা'ফু 'আনহুম ওয়াস্‌তাগফিরলাহুম ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি-ফা ইযা 'আযামতা ফাতাওয়াক্কাল' 'আলাল্লাহ্ - ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাত্তয়াক্কিলীন** - অর্থাৎ, অতএব আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপার কারণে তুমি তাদের জন্যে কোমল হৃদয়ের হয়ে গেছো। আর যদি তুমি কর্কশ (ও) কঠিন হৃদয়ের হতে তাহলে তারা অবশ্যই তোমার চারি ধার থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতো। সুতরাং তাদেরকে উপক্ষো করো এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং (প্রত্যেক) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতএব যদি তুমি (কোন) সিদ্ধান্ত করে নাও তাহলে আল্লাহ্‌র ওপরেই নির্ভর করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ১৬০)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহেও শূরা ও পরামর্শের নীতির গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

মা রায়তু আহাদান আকসারা মাশওয়ারাতান লি আসহাবিহী মির্ রসূলিল্লাহি (সঃ)

অর্থাৎ আমি হুযূর (সঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে বেশী নিজ সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করতে দেখি নি (**তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ বাবু মা জায়া ফিল্ মাশওয়ারাহ্**)।

২। হযরত আলী (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সকাশে আবেদন করলেন, কখনও কখনও এমন ব্যাপার সম্মুখে এসে যায়, যে প্রসঙ্গে কুরআন করীম বা আপনার সুন্নত (রীতি-নীতি) থেকে জ্ঞান লাভ করা যায় না। এমন অবস্থায় কী করবো? হুযূর (সঃ) বল্লেন,

ইজমা'উ লাহুল 'আবিদীনা মিন উম্মাতী ওয়াজ'আলূহু বায়নাকুম শূরা ওয়ালা তাক্বযূ বিরায়ই ওয়াহিদিন- অর্থাৎ আমার উম্মতের ইবাদতকারী বান্দাদেরকে এ উদ্দেশ্যে একত্র ক'রে বিষয় তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করো এবং সিদ্ধান্তের জন্যে কখনও একক ব্যক্তির মতামতের ওপরে নির্ভরশীল হয়ো না (**দুররে মনসূর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০, এবং ই'লামুল মূ'কি'ঈনা লি ইব্‌নি কাইইম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪**)।

৩। হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **লা খিলাফাতা ইল্লা 'আন্ মাশওয়ারাতিন**"- অর্থাৎ শূরা (পরামর্শ) ব্যতিরেকে কোন খিলাফত নেই (**কনযুল 'উম্মাল, কিতাবুল খিলাফাতি মাআলআমারাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯**)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও খলীফা (রাঃ)-গণের পরামর্শের পদ্ধতিঃ

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

১। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম অধিক সংখ্যায় পরামর্শের উভয় দিক প্রয়োগ করতেন। তিনি (সঃ) লোকদের সাথে অনেক পরামর্শ করতেন আবার লোকেরাও তাঁর সাথে খুব বেশী পরামর্শ করতো। আর অন্য দিকে এ বিষয়ও বিশেষভাবে দৃষ্টিতে থাকতো যে, যারা পরামর্শ করতো তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আদেশ ছিলো যে, যখন রসূল সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তখন আবার তোমরা এথেকে পরানুখ হয়ে সরে পড়ার অধিকার রাখো না। **এখন আঁ হযরত (সঃ)-এর পরামর্শের দু'টি দিক এইঃ এক তো পরামর্শ দিচ্ছেন, অপরটি নিচ্ছেন। যখন পরামর্শ দিচ্ছেন তখন পরামর্শ গ্রহীতার অধিকারই নেই যে, তাথেকে পরান্মুখ হয় এবং যখন পরামর্শ নিচ্ছেন তখন তাঁর অধিকার রয়েছে। কেননা, তাঁর চেয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিষয় আর কেউ অবহিত ছিলেন না"** (জুমুআর খুতবা, ২৭-৩-১৯৯৮)।

২। "আঁ হযরত (সঃ)-এর জীবনে পরামর্শের যেসব ঘটনা রয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার তো সময় নেই কিন্তু সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত মজুদ আছে। কখনও তিনি এক মহিলার পরামর্শ নিচ্ছেন, কখনও কতিপয় সাহাবার সাথে পরামর্শ করছেন, কখনও পুরো জামাতের সাথে পরামর্শ করছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গোটা জামাতের সাথে পরামর্শ করছেন আর পুরো জামাতের সিদ্ধান্তকেই নাকচ করে দিচ্ছেন" (জুমুআর খুতবা, ২৯-৩-১৯৯৬)।

৩। পরামর্শ করেছেন ছোট বড় সকলের সাথে এবং পরামর্শের মধ্যে এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন যে, পরামর্শ দেবার যোগ্যতা থাকলেই তাথেকে পরামর্শ নেয়া হয়। আর যেহেতু সব কাজে সবার যোগ্যতা থাকে না এজন্যে কোন কোন ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ লোককে ডাকা হয় ও পরামর্শ নেয়া হয়। অন্য কাজে অন্য কাউকে ডাকা হয়; কিন্তু এহেন পরামর্শ সভায়, যেভাবে এখন রীতি রয়েছে-আইনতঃ ও রীতিমত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট নেবার ব্যবস্থা-ঐ সময়ে ইহা প্রচলিত ছিলো না। ইহা সময়ের চাহিদানুসারে প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক জিনিষ উহাই যা কিনা হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরামর্শের ধরন ছিলো (জুমুআর খুতবা, ২৮-৩-১৯৯৭)

৪। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

"এখন আমি রসূলে করীম (সঃ)-ও খলীফাদের (রাঃ) যুগের পরামর্শের যে রীতি ছিলো তা বর্ণনা করছি। রসূলে করীম (সঃ) ও খলীফাগণ (রাঃ) তিন পদ্ধতিতে পরামর্শ নিতেন ঃ

(ক) যখন পরামর্শযোগ্য কোন বিষয় এসে

যেতো তখন এক ব্যক্তি ঘোষণা করতেন যেন লোকেরা সমবেত হয়ে যান। এতে লোকেরা সমবেত হয়ে যেতেন। সাধারণভাবে এ রীতিই প্রচলিত ছিলো যে, সাধারণ ঘোষণা হতো এবং লোকেরা সমবেত হয়ে পরামর্শ করে নিতেন এবং বিষয়ের সিদ্ধান্ত রসূলে করীম (সঃ) বা খলীফাগণ (রাঃ) দিতেন।

(খ) পরামর্শের দ্বিতীয় পদ্ধতি এই ছিলো যে, ঐসব বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে রসূলে করীম (সঃ) যোগ্য মনে করতেন তাদেরকে পৃথকভাবে একত্রিত করে নিতেন, অন্যান্য লোকদের ডাকা হোত না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৩০ (ত্রিশ)-এর কাছাকাছি এমন হবে যে, রসূলে করীম (সঃ) সকলকে এক স্থানে ডেকে পরামর্শ করে নিয়েছেন। কখনও ৩/৪ জনকে ডেকেও পরামর্শ করে নিয়েছেন।

(গ) তৃতীয় পদ্ধতি এই ছিলো, তিনি বিশেষ কোন ব্যাপারে, যাতে তিনি মনে করতেন যে, দু'ব্যক্তিরও একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় - পৃথক পৃথকভাবে পরামর্শ করে নিতেন। প্রথমে একজনকে ডেকে নিতেন, তার সাথে কথা-বার্তা বলে তাকে বিদেয় করে দিতেন। আবার অন্যকে ডেকে নিতেন। ইহা ঐ সময় হতো, যখন মনে করা হতো যে, সম্ভবতঃ মতভেদের কারণে দু'জনই পরস্পরে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে।

এ তিনটি পদ্ধতি ছিলো পরামর্শের জন্যে এবং তিনটিই নিজ নিজ রঙ্গে খুবই উপকারী। আমি এর সব পদ্ধতিতেই পরামর্শ নিয়ে থাকি (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২২, পৃষ্ঠা ৬-৭)।

৫। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন, "যতটা আনুগত্যের সাথে সম্পর্ক রাখে খেলাফত কেবল খোদার সকাশেই মাথা নোয়ায় না, নিজের পূর্বের উলিল আমর-আদেশ দেবার অধিকারীর নিকটেও ঐভাবে মাথা নত করে যে, চূড়ান্তভাবে তার নিজ সত্তাকে তার প্রভুর সত্তাতে বিলীন করে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব ইহাও এমন একটি বিষয় যাথেকে জানা যায় যে, খলীফাগণও এ আয়াতের তাৎপর্য ইহা বুঝেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ও অন্তর্ধানের পরে যে কাউকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আদেশ দেবার অধিকারী বানানো হবে, যদি খোদা সরাসরি বানান তাহলে তিনি ইমাম মাহ্দী হিসেবে এসেছেন ও চলে গেছেন; কিন্তু যাকেই খলীফা হিসেবে বানানো হবে তার ওপরেও এই আয়াত (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ১৬০) প্রযোজ্য হবে। যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন অবশ্যই পরামর্শ নিবেন। কিন্তু পরামর্শের পরে সিদ্ধান্ত যুগের খলীফারই অধিকারভুক্ত থাকবে আর তিনি যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাতে খোদাতাআলার সমর্থন লাভ হবে। আবার তার কাজই হলো **তাওয়াক্কাল** - (আল্লাহ্‌র) নির্ভরশীলতা আর তিনি **তাওয়াক্কাল** করলেই এবং তার **তাওয়াক্কাল** করার মধ্যেই তার সিদ্ধান্ত নিহিত থাকবে" (জুমআর খুতবা, ৩১-৩-১৯৯৫ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালের ১৯৯৫ সনের ১৮-২২ মে তারিখের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে)।

৬। "পরামর্শের রীতি মুসলমানদের মধ্যে যে মর্যাদা এবং যতটা বিস্তারিতভাবে কুরআন মজীদে পাওয়া যায় অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে এ রীতির কথা বিশ্বের কোন ঐশী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কুরআন করীমের যেসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে তার মধ্যে একটি ইহাও। পরামর্শসমূহের ও শূরার যে ব্যবস্থাপনা যুগের ইমাম ও মুসলিম উম্মতের উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে উহার কোন দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোন ধর্মে পাওয়া যায় না" (জুমুআর খুতবা ঃ ১৩-৩-১৯৯৫)।

৭। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭৩ সনের মুশাভিরাতের সময় বলেন ঃ

"কুরআন করীম বলেছে ঃ **'শাবিরহুম'** - সকলের সাথে পরামর্শ করো। এর দু'টি ধরন। একটি পরামর্শ উহা যা সারা বছর ধরে চলতে থাকে। আর উহার পরেও অনেক ধরন রয়েছে। এর একটি ধরন এই যে, কোন নায়েব বা কোন কর্মকর্তা তার কাজের প্রসঙ্গে পরামর্শ নেন বা যুগ-খলীফা যেসব বন্ধুদের নিকট থেকে যথোপযুক্ত মনে করেন তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করে থাকেন।

দ্বিতীয় ধরন এই, আর উহা বড়ই প্রিয় ধরন, যে কোন বন্ধুর মাথায় যে কোন প্রস্তাব আসে সে আমাকে জানায়। আমি বলেছি, এ ধরনটি খুবই প্রিয় কেননা, ইহা আমার মন ও মস্তিষ্কের স্বস্তির কারণ হয়ে থাকে" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত - ১৯৭৩ পৃষ্ঠা ১১-১২, ছাপা হয় নি)।

৮। "**শাবিরহুম** আদেশের মধ্যে ইহাও এসে যায় যে, প্রত্যেকটি কথা গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। কেননা, যদি একটি কথা প্রসঙ্গে পঞ্চাশ ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করে তাহলে পঞ্চাশটি পরস্পর বিরোধী কথা একই সময়ে কীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী পঞ্চাশটি কথা আমার জন্যে অনেক উপকারী ও এথেকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বের হ'তে পারে। আমি এথেকে উপকৃত হই" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৪-১৫, ছাপা হয় নি)।

৯। "অতএব **'শাবিরহুম'**-এর সাথে শূরার যতটা সম্পর্ক এতদ্দ্বারা কেবল এ উদ্দেশ্যই নয় যে, কেবল মজলিসে মুশাভিরাতে এসে পরামর্শ দিয়ে দেয়া হয় আর এখানেই দায়িত্ব শেষ। সারা বছরের প্রত্যেক দিন পরামর্শ দেয়া ও নেয়া হয়ে থাকে" [রিপোর্ট (ছাপা হয় নি) মুশাভিরাত ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১৮]।

১০। "মোটকথা এক তো হলো দৈনন্দিন পরামর্শ। ইহা অব্যাহত থাকা উচিত। **জামাতের এ অভ্যাস সৃষ্টি হওয়া দরকার, যে বন্ধুর মাথায় কোন কথা বা প্রস্তাব উদিত হয় বা কোন বন্ধুর কোন চাল-চলন যা তার নিকট পসন্দনীয় নয় বা জামাতের ঐতিহ্যের বিপরীত মনে হয়- কেন্দ্রকে অবহিত করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া আবশ্যক"** (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২১-২২, ছাপা হয় নি)।

১১। এভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)বলেন ঃ

"যতটা মজলিসে শূরার প্রশ্ন, উহাকে কোনভাবে ডাকা হবে উহার প্রতিনিধিত্বের কী পদ্ধতি হবে, নির্বাচন কোন্ নীতির ওপরে অনুষ্ঠিত হবে প্রভৃতি এসব এমন বিষয় যার মীমাংসা করা যুগ-খলীফার কাজ। আর এ প্রসঙ্গে যুগ-খলীফা পরামর্শের পরে অধিকাংশের মতামতের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন বা অধিকাংশের মতামতকে নাকচ করে সিদ্ধান্ত দেন ইহা পৃথক বিষয়-কিন্তু অবস্থা যা-ই হোক না কেন তিনি পরামর্শ নেন এবং কাজ করে থাকেন" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ২৪৬)।

১২। এভাবে ১৯৭৬ সনে মজলিসে মুশা - ভিরাতে তিনি বলেন ঃ

"যতটা পরামর্শের প্রশ্ন, **জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার নেই যে, সে পরামর্শ দেয় বরং যুগ-খলীফার অধিকার রয়েছে যে, জামাত তাকে পরামর্শ দেয়।**

এ দু'টোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যদি ইহা মনে করা হয় যে, জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা অধিকার রয়েছে যে, যুগ-খলীফাকে পরামর্শ দেয় তাহলে হাজার হাজার ব্যক্তি এমন আসবে যারা বলবে আমাদের অধিকার আছে, আমরা ইহা পরিত্যাগ করছি, আমরা পরামর্শ দিচ্ছি না। কিন্তু যদি ইহা মনে করা হয়, যুগ-খলীফার অধিকার রয়েছে যে, যার মাথায় কোন এমন প্রস্তাব উদিত হয় যা জামাতের উন্নতির জন্যে কল্যাণজনক হয় তা যেন যুগ-খলীফার নিকট পর্যন্ত পৌছে দেয় আর যখন ইহা যুগ-খলীফার অধিকার হয় আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রস্তাব যুগ-খলীফার নিকট না পৌছায় তাহলে সে অধিকার খর্বকারীতে

পরিণত হবে। প্রথম ধরনে সে বলবে যে, অধিকার আমি প্রয়োগ করলাম না। দ্বিতীয় ধরনে সে যুগ-খলীফার অধিকার খর্ব করছে। তার এ অনুমতি লাভ হ'তে পারে না। কিন্তু সাধারণ পরামর্শের সাথে যতটা সম্পর্ক, আমি জামাতের এসব হাজার হাজার ব্যক্তির ও নিজেদের ভাইদের নিকট অশেষ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি যে, তারা আমাকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন আর খুবই ভাল ভাল পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইহা পৃথক বিষয় যে, কখনও তাদের মাথায় খুবই ভাল ভাল কথা জাগরিত হয় কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ও বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যা আমরা পেয়েছি-উহার কারণে আমরা ঐ পরামর্শকে বাস্তবে কার্যকর করতে পারছি না। কিন্তু ঐসব কথা যদিও খুবই উত্তম আর কোন সময় আমাদের কাজেও আসতে পারে" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ২৪৫, ছাপা হয় নি)।

১৩। ১৯৭৮-এর মজলিসে শূরায় সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন ঃ

"কুরআন করীম পরামর্শ ও সংকল্পকে পরস্পরের সাথে সংবদ্ধ করেছে- **ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি ফা ইযা 'আযামতা ফা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্**। তাই পরামর্শ করা খুবই আবশ্যক। পরামর্শের পরে ৪টি আকার ধারণ করে ঃ ১। শূরা সর্বসম্মত রায় দেয় আর যুগ-খলীফা এতে অনুমোদন দেন। ২। অধিকাংশের রায়ের পক্ষে যুগ-খলীফা সিদ্ধান্ত দেন। ৩। সল্পাংশের রায়ের পক্ষে যুগ-খলীফা সিদ্ধান্ত দেন। ৪। ...সর্বসম্মত রায় সম্বলিত পরামর্শের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।

আদেশ ইহাই যে, যে আকারেই হোকনা কেন যে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তখন শতকরা একশ' ভাগের জন্যে ইহা আবশ্যক যেন তারা সকলে কাজ করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়। এ অর্থে শূরাকে সংকল্পের সাথে বন্ধনীযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। উভয়কে একতাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে" [রিপোর্ট মুশাভিরাত, ১৯৭৮, (ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা ৩-৫ সংক্ষিপ্তাকারে]

১৪। এভাবে আরো বলেন ঃ

"আদেশ এই যে, **ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি ফা ইযা 'আযামতা ফা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলীন** - পরামর্শ করা অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মেধা, চিন্তা ও চেতনা অন্যের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আর যখন প্রত্যেকটি চিন্তাকে সুযোগ দেয়া হয়, যদি এ মেধায় কোন কথা এমন থাকে যা তার দৃষ্টিতে সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার জন্যে কল্যাণপ্রদ তাহলে বিনা দ্বিধায় তা বর্ণনা করে। আর এর মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পরামর্শ গ্রহীতা তিনি আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে না যায় যে, আমি ব্যতিরেকে আর কারও মাথায় কোন কথা আসতেই পারে না। কিন্তু সিদ্ধান্ত পরামর্শ গ্রহীতার হাতে দেয়া হয়েছে। পরামর্শ শুনা আবশ্যক, গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। [রিপোর্ট মুশাভিরাত ১৯৮২, (ছাপা হয় নি) পৃষ্ঠা ২-৩]

১৫। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঃ

"আহমদী জামাতের সকল সদস্যের জন্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অভিন্ন উচ্চারণ এবং জাতীয় দায়িত্বাবলী পালনে সমঝোতার জন্যে এক ব্যক্তির হাতে বয়াত করা আবশ্যক এবং এ বয়াত ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই ব্যক্তি যাঁর হাতে বয়াত করা হয় তাঁকে কুরআনের আদেশানুযায়ী খলীফা বা সাহাবাগণের রীতি অনুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন বলা হবে। আর সকল সামগ্রিক বিষয়াদিতে জামাত তাঁর মধ্যস্থতায় ও তাঁর পথ-নির্দেশনায় এবং তাঁর পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে চলবে। আর তাঁর অধিকারসমূহকে সীমাবদ্ধকারী বিষয়গুলো কেবল খোদাতাআলার ইচ্ছা, তাঁর বাণী এবং তাঁর কর্ম ও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুন্নত ও হাদীসসমূহ, যা কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী আর মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ওহী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের গ্রন্থাদি এবং তাঁর খলীফার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী হবে"

পরামর্শ নেবার অধিকার ইসলাম নবীকে ও তাঁর প্রতিনিধিত্বে খলীফাকে দিয়েছে। কিন্তু কেউ ইহা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না যে, নবী বা খলীফার সম্মুখে প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করার অধিকার অন্যান্যদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কোথাও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে যে, কেউ নিজের পক্ষ থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে এবং ইহাকে নিজের অধিকার মনে করেছে" (রিপোর্ট মুশাভিরাত, ১৯৩০, পৃষ্ঠা ৭)।

১৬। এভাবে তিনি আরও বলেন ঃ

"পার্থিব পরামর্শ সভায় তো এই হয়ে থাকে যে, এতে উপস্থিত সকলেই বলতে পারে, হয় আমার কথাকে নাকচ করে দাও নয়তো মেনে নাও। কিন্তু খেলাফতের ব্যবস্থাপনায় কারও ইহা বলা অধিকার নেই। ইহা খলীফারই অধিকার, যে বিষয়ে পরামর্শ করার যোগ্য মনে করেন ঐ বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করেন এবং মজিলসে শূরার উচিত ঐ বিষয়ে মতামত দেয়। মজলিসে শূরা এতদ্ব্যতিরেকে নিজস্ব সত্তায় আর কোন অধিকার রাখে না। খলীফা যে বিষয়ে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চান তাতেই ইহা পরামর্শ দেয় (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৩০, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।

১৭। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৭০ সনের মজলিসে শূরার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ

"এখন এ শূরার যে কার্যক্রম ছিলো তাতো শেষ হয়ে গেলো কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম রয়েছে তাতো ইনশাআল্লাহ্ আগামী শূরা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯৭০ (ছাপা হয়নি) পৃষ্ঠা ২৯২)।

১৮। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৩ সনের মজলিসে শূরাতে বলেন ঃ

"ইসলামী শূরার ব্যবস্থাপনায় মহিলা বা পুরুষের পরামর্শ দেবার অধিকারের কথাই কোথাও বলে না; বরং শূরার প্রসঙ্গে দু'ভাবে বলা আছে, একতো **ওয়া শাবিরহুম ফিল আমরি** - এতে পরামর্শ গ্রহীতার প্রতি আদেশ রয়েছে অর্থাৎ তিনি স্বয়ং রসূলই হন বা খেলাফতের মসনদে যিনি আসীন থাকেন তাঁর প্রতিনিধিত্বে তিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে এ আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর জন্যে আদেশ, অবশ্য কর্তব্য (ফরয) যেন তিনি অবশ্যই পরামর্শ নেন" [মজলিসে মুশাভিরাত ১৯৮৩ (ছাপা হয় নি), পৃষ্ঠা ৭৪]।

১৯। ১৯৬৭ সনের মজলিসে শূরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বলেন ঃ

"আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র আদর্শের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে তাঁর (সঃ) যুগের অবস্থানুযায়ী তিনি (সঃ) ১০/১৫ থেকে ১ হাজার পর্যন্ত লোককে নিয়ে পরামর্শ করেছেন। ইতিহাস আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এমন পরামর্শ সভা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছে যে, তাতে পরামর্শ দাতার সংখ্যা ১০/১৫ জনের অধিক ছিলো না। অতএব জানা গেলো যে, ১০/১৫ জন থেকে ১ হাজার পর্যন্ত লোক নিয়ে পরামর্শ সভা আয়োজনের সুন্নত প্রতিষ্ঠিত আছে" [রিপোর্ট মজলিসে শূরা ১৯৬৭ (ছাপা হয়নি), পৃষ্ঠা ৬৫]। (চলবে)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৯-১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০১, সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ও দাওয়াতে ইলাল্লাহ্

মহান আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। তাদের দৈনিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মার সংশোধনেরও ব্যবস্থা রেখেছেন। সে কারণে যুগে যুগে মানুষের মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন জাতির মাঝে নবী প্রেরণের পর বিশ্ব-জগতের জন্য আল্লাহ্র রহমত হিসাবে এলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত মহান শিক্ষা থেকে মানুষ যখন দূরে সরে গেল তখন আল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এ যুগে প্রেরণ করেন। তাঁর হাতেই ইসলাম ধর্মের পুনঃ জাগরণ ও বিজয় নির্ধারিত। সেজন্য খোদা তাঁকে আহ্বানকারী হিসাবে মনোনীত করেছেন। খোদা তাঁকে জানিয়েছেন, "তোমার তবলীগকে আমি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব। যে সকল লোক তোমার এ কাজে সহায়তা করবে আমি তাদের ওহী দ্বারা কাজ করার সামর্থ্য দান করবো।" আল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে ওহী দ্বারা এক পুত্রের অর্থাৎ হযরত ফযলে ওমর মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) সম্পর্কে সুসংবাদ দেন, "পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তিনি খ্যাতি লাভ করবেন। নিজ পবিত্র আত্মা ও সততার বরকতে বহু লোককে ব্যাধি মুক্ত করবেন। তিনি মেধাবী, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ হবেন"।

তবলীগের কাজ শুরুর আগেই আল্লাহ্ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এ কথা জানিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মের পর পরই আল্লাহ্র আদেশে মসীহ মাওউদ (আঃ) পবিত্রচেতা ব্যাক্তিদের বয়াত গ্রহণ করান। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, দুনিয়াতে ইসলামের তবলীগের ক্ষেত্রে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বিরাট ভূমিকা রাখবেন।

তবলীগের কাজ ইমাম মাহদী (আঃ) শুরু করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১ম খলীফা (রাঃ) একাজ সুষ্ঠুভাবে করেন। তাঁর সময়ে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ইসলাহ্ ইরশাদের দায়িত্বে ছিলেন। এ কাজ তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি বলতেন "আমি প্রায় স্বপ্ন দেখি আমি একটি ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে বিভিন্ন দেশ বিজয় করেছি।" তিনি আরও বলতেন "আমাদের বেশী ভাষা জানা লোকের প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তবলীগ সহজ হয়। ভারতে এমন কোন গ্রাম যেন বাকী না থাকে যেখানে আহমদীয়তের সংবাদ পৌছায় নি"।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে তিনি খেলাফতে আসীন হন। ১৯১৭ সনের ১২ই মার্চ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বাশিয়াতে অনুষ্ঠিত বিপ্লবের মাধ্যমে জারের চূড়ান্ত পতন হয়। ১৯১৫ সালে হুযূর (রাঃ) পবিত্র কুরআনের প্রথম পারার উর্দূ ও ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্যে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়। তখনকার দিনের বিখ্যাত পত্রিকা 'মুসলিম ওয়াল্ডে' এ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যাতে বলা হয় ইসলাম না খৃষ্টান ধর্ম কোন্‌টি এই যুদ্ধে জিতবে তার সিদ্ধান্ত ভারতের কাদিয়ানের উপর নির্ভর করে। এ বছর জামাতের লন্ডন আঞ্জুমান যা ১ম খলীফা (রাঃ)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত হয় তা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা অর্জন করে। পূর্বে এটি পরিচালিত হ'ত আনসারুল্লাহ্র তহবিল থেকে। এ সময় এখানের মিশনারীর দায়িত্বে ছিলেন হযরত চৌধুরী ফতেহ্ মুহম্মদ সাইয়াল (রাঃ)। এ সময়ে হুযূর (রাঃ) প্রবীণ মোখলেস সাহাবী হযরত সূফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বি, এ কে মরিসাসে জামাত প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠান। তিনি ইংরেজী, উর্দূ ও আরবীতে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সিংহল হয়ে মরিসাসে যান। এ দুই স্থানে তিনি নতুন জামাত কায়েম করেন।

১৯১৬ সালে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ভারতের প্রবেশ পথ বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) ব্যাপক প্রচারের জন্য এক ব্যূহ রচনা করেন। এজন্য একদল বিশিষ্ট সাহাবীকে এখানে পাঠানো হয়। এ দলের সদস্য ছিলেন হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব, হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব, হযরত মৌলভী ইসমাঈল সাহেব ফাযেল (রাঃ)। পরে হযরত মুফতি মুহম্মদ সাদেক সাহেব ও মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব প্রমুখ সাহাবী এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হ'লে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী ও বুযূর্গ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ)-কে আমেরিকাতে ইসলাম প্রচারে পাঠান। তিনি এখানে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ করেন এবং জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইনশাআল্লাহ্তাআলা এই মিশন খুবই সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

১৯২১ সালে হুযূর (রাঃ) হযরত মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেব নাইয়ার (রাঃ)-কে আফ্রিকাতে পাঠান। তিনি প্রথম দু'বছর লন্ডনে থাকেন, পরে পশ্চিম আফ্রিকাতে যান। এখানে খোদাতাআলা তাঁকে অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে বড় বড় জামাত কায়েম করার তৌফীক দেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রা, মনপুর, আলীগড় জেলা, মালকানা রাজ্য, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে রাজপুত সম্প্রদায়ের লোকের বাস। যারা ভারতে ইসলাম আগমনের সময় ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তা'লীম তরবিয়তের অভাবে তারা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে মালকানা রাজপুত বলা হয়। হিন্দুদের আর্য সমাজী সম্প্রদায় এই সব মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে নিয়ে আসার জন্য শুদ্ধি অভিযান চালায়। ১৯২২-২৩ সালে এ অভিযান শুরু হয়। হুযূর (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে জামাতের শিক্ষক, চাকুরীজীবী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক ও আরবী এবং ইংরেজী জানা লোকদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নিজ খরচে এই শুদ্ধি অভিযানের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। আহমদীদের প্রচার ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আর্যসমাজ তাদের শুদ্ধি অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ফলে অনেক লোক ধর্মচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। সাথে সাথে অনেক অস্পৃশ্য জাতির লোকজনও আহমদীয়া জামাতে বয়াত গ্রহণ করে। যেমন মোজাহারী শিখ, বাল্মীকী প্রভৃতি সম্প্রদায়। এজন্য জামাতের সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আহমদীদের বিরোধী অন্যান্য ফিরকার লোকেরাও এ কাজের জন্য জামাতের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।

১৯২৪ সালে ইংরেজ রাজত্বের সকল ধর্মীয় নেতাদের লন্ডনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ সম্মেলন যোগদানের জন্য আহুত হন। তিনি ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশের মধ্যে দিয়ে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এসব স্থানে তবলীগের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ সময় দামেস্কের এক বিশিষ্ট লেখক হুযূর (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি কথা প্রসঙ্গে জানান, "হিন্দুস্থানের লোকজন যতই আরবী জানুক না কেন তারা আমাদের আরবী ভাষীদের মত কুরআনে বুৎপত্তি লাভ করতে

পারবে না। সেজন্য আপনাদের জামাত এখানে স্থাপন সম্ভব নয়।" হুযূর বলেন, "আমি বিভিন্ন স্থানে তো মোবাল্লেগ পাঠাবো, কিন্তু ভারতে ফিরেই আমার প্রথম কাজ হবে আপনাদের এখানে মোবাল্লেগ পাঠানো। দেখা যাক খোদার ঝান্ডা যাদের হাতে তাদের সামনে কারা দাঁড়াতে পারে।" তিনি লন্ডনের ধর্মীয় সম্মেলনে যে বক্তৃতা দেন তা সকলকে মুগ্ধ করে এবং সকল শ্রোতা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, এই সম্মেলনের সিংহভাগ সাফল্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ও তাঁর জামাতের। যে সন্দর্ভ Ahmadiyyat the True Islam হুযূর (রাঃ) সম্মেলনে পাঠ করেন তার উর্দূ নাম ছিল আহমদীয়ত আওর হাকীকী ইসলাম। জামাতের পুস্তকাবলীর মধ্যে এই পুস্তকটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ সফরে হুযূর (রাঃ) লন্ডনের ফযল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

১৯২৫ সনে সুমাত্রা ও জাভাতে আহমদীয়ত কায়েম হওয়ার ফলে পূর্ব এশিয়াতে জামাতের ব্যাপক বিস্তার হয়। মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এ সময় ভারতের ধর্মীয় উত্তপ্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সীরাতুন নবী সভা ও সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজনের জন্য ভারতের সকল জামাতকে আদেশ দেন। এর ফলে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তবলীগী কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। এ সময় দেশের বেশ কিছু অংশে বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। হুযূর (রাঃ) অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রতিবাদের আহ্বান করেন। তিনি নিজে কাশ্মীর রেজিমেন্ট তৈরী করে ব্যাপক প্রচার ও সেবামূলক কাজ শুরু করেন। এ রেজিমেন্টের প্রধান ছিলেন জামাতের ৩য় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ)। এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ ও কাশ্মীরের রাজা জনগণের দ্বারা পার্লামেন্ট গঠনের জন্য নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় এবং মুসলমানেরা শাসন ব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য অধিকার পায়। এছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং সরকারী চাকুরীর সুবিধা পায়। ব্যাপক হারে কাশ্মীরে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আহমদীদের এ বিজয় দেখে বিরোধী মুসলমানদের এক অংশ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আহরারী পার্টি নামে এক সংগঠন তৈরী করে। তারা আহমদীয়তকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করার জন্য জেহাদ ঘোষণা করে। দেখতে দেখতে আহরারী ফেৎনা বিস্তৃত লাভ করতে থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আল্লাহ্‌র ইলহাম পেয়ে জানান, "আমি দেখতে পাচ্ছি আহরারী জামাতের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে"। জগদ্বাসী তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী সূর্যের আলোর মত পূর্ণ হ'তে দেখেছে। তিনি ১৯৩৪ সনে আহরারী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জামাতের সামনে এক আসমানী কর্মসূচী রাখেন এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি (রাঃ) বলেন,"সকলের কাছে আহমদীয়তের সংবাদ পৌছানোর জন্য আমাদের লোক প্রয়োজন, টাকার প্রয়োজন, ধৈর্য ও দোয়ার প্রয়োজন, এমন দোয়া যা খোদার আরশ কাঁপিয়ে দেয় এবং আমাদের সকল চাহিদা পূরণ হয়"। এই কর্মসূচীর ফলে তা'লীম তরবিয়তের শক্তিশালী ব্যবস্থা জামাতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজ সরল জীবন যাপন, নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস জামাতের মধ্যে সৃষ্টি হয়। অল্প দিনের মধ্যে গরীব জামাতের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর এক নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়। ফলে বহির্বিশ্বে আহ্‌মদীয়তের প্রচারের কাজ পূর্ণ উৎসাহে শুরু হয়। এই কম-সূচীর নাম তাহরীকে জাদীদ। ১৯৩৪ সাল থেকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ইসলাম প্রচারের কাজ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালু হয়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচীর অধীনে বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "তিনি তাড়াতাড়ি বড় হবেন"। সে ভাবে সকল কাজ সার্থকভাবে কম সময়ে সম্পাদন হতে থাকে। তিনি এ সময়ে সিংগাপুর, হংকং, জাপান, প্রভৃতি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন।

১৯৩৬ সনে হাঙ্গেরী, আলবেনীয়া, যুগোস্লাভিয়া, আরজেন্‌টিনা, উত্তর আমেরিকাতে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সনে ইটালী ও পোল্যান্ডে মিশন হাউস খোলা হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট ৬০টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক বয়াত করে। এভাবে তাঁর সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করবেন-তা পূর্ণ হয়। এছাড়া তিনি তোহফায়ে শাহাজাদা, ও দাওয়াতুল আমীর প্রভৃতি পুস্তকের মাধ্যমে তখনকার বাদশাহ্ ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে আহমদীয়তের দাওয়াত দেন। তিনি জামাতের ব্যবস্থাপনার একটি রূপরেখা তৈরী করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। ফলে সমগ্র জামাত একটি বৃহৎ পরিবারের মত কাজ করার সুযোগ পায়। ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআন করীমের প্রকৃত তাৎপর্য ও শিক্ষাকে মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য হাজার হাজার পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী বিতরণ করেন। কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠ তফসীর-তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর এবং জীবন ব্যাপি প্রদত্ত দরস সংরক্ষণ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে তবলীগী কাজের জন্য প্রথমে ওয়াককে আরযী ও পরে দেহাতী মোয়াল্লেমের ব্যবস্থা করেন।

১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারত উপ-মহাদেশের অভ্যন্তরীণ তবলীগের জন্য ওয়াকফে জাদীদ কার্যক্রম প্রচলন করেন। এ কর্মসূচীতে দেহাতী মোয়াল্লেমগণ প্রশিক্ষণ পেয়ে গ্রামের গরীব ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রচার ও তরবিয়তে কাজ শুরু করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জীবিত থাকাকালীন সময়ে ওয়াকফে জদীদের কাজ বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পাদন করেন। বর্তমানে ওয়াকফে জাদীদের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এই কর্মসূচীকে গোটা বিশ্বের সকল দেশের জন্য প্রচলন করেছেন।

ফযলে ওমর হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর ৫২বছর খেলাফত জীবনের তবলীগী কার্যক্রম পৃথিবীর ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে এবং প্রতিটি আহমদীর হৃদয়ে তাঁর কার্যক্রম অনুপ্রেরণার উৎস হবে।

তথ্য সূত্র ঃ সপ্তাহিক বদর

- কওসার আলি মোল্লা

এ তাহরীক সম্বন্ধে অন্যদের প্রশংসা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)- এর এ মহান তাহরীক তদানীন্তন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তারাও হুযূর (রাঃ)-এর এ তাহরীকের ভূয়ষী প্রসংসা করেন। এ প্রসঙ্গে লাহোর থেকে প্রকাশিত "ইনকিলাব"-এর ৪-১২-৩৪ তারিখের একটি নোটের আংশিক উদ্ধৃতি প্রদান করছি ঃ

"আহমদীদের ইমাম তাঁর অনুগামীদের আদেশ দিয়েছেন যে, আগামী ৩ বছরের জন্য যেন তারা সিনেমা, থিয়েটার ও সার্কাস ইত্যাদি অবশ্যই না দেখে। খাওয়া-পরায় যেন অত্যন্ত সাদা-সিদে পন্থা অবলম্বন করে। বিনা প্রয়োজনে কাপড়-চোপড় তৈরী না করে । যতদুর সম্ভব পুরাতন কাপড় দিয়ে দিন চালায় এবং তবলীগের জন্যে চাঁদা দেয়। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যারা আজকাল কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার তাদের উচিত তারাও যেন এথেকে উপকৃত হয়।"

তাহরীকে জাদীদের দপ্তরসমূহ ঃ

(ক) তাহরীকে জাদীদের প্রথম দপ্তর ঃ

প্রথমে ৩ বছরের জন্যে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৩৭ সনের ২৬ শে নভেম্বর তাহরীকে জাদীদের ২য় বছরের ঘোষণা করেন যা এপ্রিল ১৯৪৪ সন পর্যন্ত চলে এবং একে তারীকে জাদীদের দপ্তরে আওওয়াল (প্রথম দপ্তর) নামে ঘোষণা দেয়া হয়। হুযূর (রাঃ) জামাতের নিকট তাহরীকে জাদীদের জন্যে প্রথম ২৭ হাজার টাকার একটি ফান্ডের প্রস্তাব দেন। জামাত সেখানে ৯৮ হাজার টাকার একটি ফান্ড পেশ করে দেয়। তাহরীকে জাদীদের প্রথম দপ্তরের মুজাহিদীনের সংখ্যা ছিল ৫,০০০। প্রথম দপ্তরের মেয়াদ ছিল ১৯৩৪-১৯৪৪।

দ্বিতীয় দপ্তরের ঘোষণা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৪৫ সনের মে মাসে তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে দওম (দ্বিতীয় দপ্তর)- এর ঘোষণা দেন আর এ দপ্তরের মুজাহিদগণের জন্যে ৩টি শর্ত আরোপ করেন। ১৯৪৫ সনের মে মাস থেকে যারা এ তাহরীকে অংশ গ্রহণ করেছেন (জন্মসূত্রেই হোক বা বয়াত সূত্রেই হোক) তারা এ দপ্তরের মুজাহিদ। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১) চাঁদা যেন এক মাসের আয়ের সমান হয়।

২) তারা ১৯ বছর পর্যন্ত চাঁদা দিতে থাকুন এবং প্রত্যেক বছর এতে বাড়িয়ে দিন।

আমাদের চাঁদা
(৭ম কিস্তি)

৩) আয় বন্ধ হয়ে গেলে বা চাকুরী থেকে অবসর নিলে সত্বর যেন তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানকে অবহিত করা হয়।

৪) এ দপ্তরের মুজাহিদ ছিলেন প্রায় ২০,০০০। প্রথম বছরের ওয়াদা ছিল ৫২,৭২৫/- ১৯৬৩ সনে যা ২,০৯,০০০/- টাকায় উন্নীত হয়। দ্বিতীয় দপ্তরের মেয়াদ ছিলো ১৯৪৪-১৯৬৫।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় দপ্তরের নেগরানীর দায়িত্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্কন্ধে ন্যস্ত করেন।

তৃতীয় দপ্তরের ঘোষণা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ২২শে এপ্রিল, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে সওম (তৃতীয় দপ্তর)-এর ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অসুস্থতার কারণে এ দপ্তরের ঘোষণা দিতে পারেন নি। তাই তিনি নির্দেশ দেন ১৯৬৫ সনের ১লা নভেম্বর থেকে এ দপ্তরের কাজ গণ্য হবে যাতে তৃতীয় দপ্তরকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর সময়ে থেকে গণ্য করা যায়। যেসব আহমদী এ সময়ে ও এর পরে এই মহান তাহরীকে অংশগ্রহণ করেছেন তারা এ দপ্তরের মুজাহিদ বলে গণ্য। হুযূর (রাহেঃ) আশা করেছিলেন, তৃতীয় দপ্তরের মুজাহিদগণ তাদের চাঁদার ওয়াদা ৮ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত পৌছে দিবেন। তৃতীয় দপ্তরের মেয়াদ ১৯৬৫-১৯৮৫।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৬ সনে এ দপ্তরের নিগরানীর দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্র স্কন্ধে ন্যস্ত করেন এবং বেশী বেশী লাজনার অন্তর্ভুক্তির আশা করেন।

চতুর্থ দপ্তরের ঘোষণা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৫ সনে ২৫শে অক্টোবরের জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে চাহরম (চতুর্থ দপ্তর)-এর ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আজ থেকে যত নূতন মুজাহিদ তাহরীকে জাদীদে শামেল হবেন তারা তাহরীকে জাদীদের চতুর্থ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ১৯৮৫ সনের ১লা নভেম্বর থেকে এ দপ্তর কার্যকরী হয়। ২০০০ সনে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার আদায়ের পরিমাণ ২ লক্ষ পাউন্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম দপ্তরের মুজাহিদীনের কুরবানীকে জাগ্রত করুন ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৪ ২৬শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন ঃ "প্রথম দপ্তরের মুজাহিদীনের এক বিশেষ মকাম ও মর্যাদা রয়েছে। এ দলটির বেশীর ভাগই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আইঃ)-এর সাহাবা এবং পরবর্তীকালের বুযূর্গানের সমন্বয় গঠিত। সুতরাং তাদের হক্ এই যে, তাঁদের কুরবানী যেন তাঁদের মরণোত্তর সময়েও জারী রাখা হয়। এসব মুজাহিদীনের সন্তানগণ যেন তাদের পিতৃ-পুরুষের কুরবানীসমূহকে পুনর্জীবিত করেন যাতে কিয়ামতকাল ব্যাপী সেগুলোকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং নিজেদের ও পরবর্তী বংশধরগণের গৃহগুলোকে কল্যাণ ও আশিসে ভরপুর করে নিতে পারেন।"

হুযূর (আইঃ) আরও বলেন, "প্রথম দপ্তরে এমন কিছু ওফাতপ্রাপ্ত মুজাহিদও থাকতে পারেন যাদের কোন সন্তানাদি নেই। তাহরীকে জাদীদের দপ্তর আমাকে এইরূপ বন্ধুদের তালিকা সংগ্রহ করে দিন। তাঁদের কুরবানীকে জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে আমি তাদের পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করবো।" হুযূর (আইঃ)-এর উপরোক্ত ঘোষণা দ্বারা প্রথম দপ্তরের মুজাহিদীনের সন্তান-সন্ততি এবং জামাতের দায়িত্ব যে কতখানি বেড়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহ্রীককে স্থায়ী করা হ'ল ঃ

তাহরীকে জাদীদের ঘোষণাকালীন সময়ে ৩ বছরের জন্যে তাহরীকে ওয়াকফে জিন্দেগী জারী করা হয়েছিল। কিন্তু চাহিদা ব্যাপকতর হওয়ার কারণে ১৮-১২-১৯৩৭ তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একে স্থায়ী রূপ দেয়ার নিমিত্তে ওয়াকেফীনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাতে গিয়ে ঘোষণা করেন ঃ

"আগামীতে যেসব লোক নিজেদেরকে ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করবে তারা যেন ইহা বুঝে করে যে, নিজেদেরকে ফানা বা বিলীন মনে করতে হবে আর যে কাজে তাদেরকে লাগানো হয় পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে যেন সে কাজ করে। জ্ঞান-বুদ্ধির অনুমান করা তো আমাদের কাজ কিন্তু পরিশ্রম, আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সংকল্প তাকেই করতে হবে। অন্যদিকে এ খেয়ালও রাখতে হবে যে, ওয়াকফের অর্থ এই নয় যে, সে অকর্মণ্য মজুর প্রমাণিত হয়, আর ইহাও হবার নয় যে, আমরা তাকে বরখাস্ত করব না বা শাস্তি দিব না। সে-ই কেবল

নিজেকে নিজে পেশ করুক যে শাস্তি ভোগ করতে পারবে। যে জাতি বা যে ব্যক্তির মধ্যে শাস্তি ভোগ করার শক্তি নেই সে সর্বদা ধ্বংস হয়েই থাকে। সাহাবা (রাঃ)-দেরকে দেখ, কখনও কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাস্তি তাঁরা বরদাশ্‌ত করতেন আর স্বেচ্ছায় করতেন, ... অতঃপর ওয়াকফকারীদের জন্যে এ পাঁচটি গুণ ব্যতিরেকে ইহাও প্রয়োজন যে, তারা শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। পরে ইহা না বলা হয় যে, ঐ সময় তো আমি একটি চাকুরী পেতাম। অতঃপর ঐ ব্যক্তিই এগিয়ে আসুক যার নিয়্যত ইহা হোক যে, চেষ্টা করবো। যদি অকর্মণ্য প্রমাণিত হই তবে স্বেচ্ছায় শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য থাকবো।"

"আমি আশা করি, আমাদের যুবকগণ আমাদের উদ্দেশ্য পূরণার্থে এসব শর্ত মেনে শীঘ্র শীঘ্র নিজেদের নাম পেশ করবে যাতে এ পরিকল্পনাধীনে কাজ করতে পারেন। আমরা লোক তো খুব কমই নেব। হাজারের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই আমরা বেছে নেব। ৫/৭ জনের মধ্য থেকে নেয়ার চেয়ে তারা অবশ্যই ভাল হবে। গতবার ২ শত যুবক নিজেদেরকে পেশ করেছিল আর এখন আমার ধারণা যে, তার চেয়ে বেশী পেশ করবে। যারা গতবার নিজেদেরকে পেশ করেছেন তারাও এখন পেশ করতে পারেন আর যারা কাজে নিয়োজিত আছেন তারাও পেশ করতে পারেন। কেননা, তারা তো ৩ বছরের জন্যে পেশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা মনে করতে পারেন যে, ৩ বছর তো আমাদের জানা ছিল না। যেমন একবার নিজেকে পেশ করে দিয়েছেন তো পিছে ফিরে যাবেন কেন? তাদেরকে সময় মত নাম পেশ করতে হবে। কেননা, প্রথমে আমাদের মোতালেবা ছিল মাত্র ৩ বছরের আর যারা নিজেদেরকে পেশ করবে দৃঢ় সংকল্প ও উদ্দেশ্য নিয়ে যেন করে।"

ওয়াক্‌ফে জীন্দেগীর জন্যে নিয়ম কানুন ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৫২ সনে নির্দেশ দেন, যারা ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গ) করতে চান তাদের নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে ঃ

(১) যাদের অধিক সন্তান-সন্ততি তাদের মধ্য থেকে যেন একজনকে ওয়াক্‌ফ করা হয়। আমরা অন্যের পথ বন্ধ করছি না তারাও ওয়াক্‌ফ করতে পারে তবে এ রকম নিয়ম জরুরী যে, প্রয়োজনবোধে সহজেই যারা পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, তারা যেন সুযোগ নেয়।

(২) ওয়াকফে জিন্দেগী অবশ্যই যেন সাবালক হয়। আগামীতে ২১ বছরের কম বয়সের লোক থেকে যেন ওয়াক্‌ফ গ্রহণ করা না হয়। পূর্বের ওয়াক্‌ফ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ যেন বন্ধ না করা হয়। ওয়াক্‌ফ যেন ছেলের হয়, পিতারও না হয় আর লোক দেখানোর জন্যেও না হয় বরং সত্যিকারের হয়।

(৩) একুশ বছর বয়সের পূর্বে যাদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হয়, অর্থাৎ জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষার্থীদেরকে যা দেয়া হয়, তা যেন কর্জ হিসেবে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ওয়াকেফীনের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের মধ্যে তা শামেল হবে আর ওয়াকেফ না থাকলে ইহা কর্জ হিসাবে গণ্য হবে এবং শর্ত অনুসারে আদায় করতে হবে।

(৪) প্রাক্তন ওয়াকেফীন, যাদের ব্যাপারে সেলসেলার অর্থ খরচ হয়েছে, তারাই নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অর্থ ফেরৎ দিয়ে অবকাশ নিতে পারেন।

(৫) যেসব পিতা-মাতা নিজ সন্তান-সন্ততিকে ওয়াক্‌ফ করতে চান তাদেরকে যেন অপেক্ষমান ওয়াকেফীনের তালিকাভুক্ত করা হয়। যখন তাদের বয়স ২১ বছর হবে তখন তাদেরকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা নিজেদের ইচ্ছায় জীবন ওয়াক্‌ফ করছে কি-না। যদি তারা ওয়াক্‌ফ না করতে চায় তাহলে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে। আর যদি তারা ওয়াকফ করতে চায় তবে তাদের ওয়াক্‌ফ মঞ্জুর করা হবে (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত ঃ ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০)।

ওয়াক্‌ফে নও তাহরীক (নব উৎসর্গের ঘোষণা) ঃ

তাহরীকে জাদীদের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আজ আহমদীয়ত ছড়িয়ে পড়েছে এদিক সেদিক বিশ্বের চতুর্দিকের ১৭০টি রাষ্ট্রে। হাজার হাজার জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে। চতুর্দিক থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রবেশ করছে এ পবিত্র সিলসিলায়। এদের সঠিকভাবে তালীম ও তরবিয়ত দেয়ার জন্যে চাই অসংখ্য মুরব্বী ও মোয়াল্লেম। অদূর ভবিষ্যতে এ চাহিদা আরও বাড়বে-বেড়ে চলবে। সময়ের চাহিদাকে মিটাবার জন্যে তাই আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) ১৯৮৭ সনের এপ্রিল মাসে একটি নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন যা 'ওয়াক্‌ফে নও তাহরীক' নামে খ্যাত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী ২ বছরে আহমদীগণের নবাগত সন্তানদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করতে হবে ইসলাম ও আহমদীয়তের সেবায়। তখন তিনি জামাতের নিকট ৫০০০ শিশুর চাহিদা পেশ করেছিলেন (১০-২-৮১ তারিখের খুতবা দ্রষ্টব্য)। পরে অবশ্য সময়-সীমাকে ৪ বছর করা হয়েছিল। বর্তমানে ওয়াক্‌ফ ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা ২০ হাজার ৫শ' ১৫ জন; ছেলে ১৪,২৫৯ এবং মেয়ের সংখ্যা ৬,২৫৬ জন।ওয়াকফের তাহরীক এখন জারী আছে।

হুযূর কেবল ওয়াকফের ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি। কীভাবে তাদেরকে চাহিদামত গড়ে তুলতে হবে সেজন্যে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করে পিতা-মাতা ও জামাতের ওপর যুগ্ম দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আগামী ২০ বছরের মধ্যে দুনিয়ার সামনে আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদীনের একটি বিরাট দল সৃষ্টি হবে যারা তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করবে। তখন দুনিয়া তাহরীকে জাদীদের মহান সুফলের আরও বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পাবে, ইনশাআল্লাহ্।

তাহরীকে জাদীদের রেজিষ্টেশনঃ

১৯৩৮ সনের অক্টোবর মাসে তাহরীকে জাদীদের রেজিষ্ট্রেশন করা হয় আর তখন থেকে এর পূর্ণ নাম হয় **তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। পরে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী পশ্চিম পাকিস্তান-এর অধীনে এ আঞ্জুমানের রেজিষ্ট্রেশন করা হয় ১৯-২-৪৭ তারিখে।**

তাহরীকে জাদীদের চাঁদার হার ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) প্রথম তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশ গ্রহন করার জন্যে নিম্নতম হার ধার্য করেছিলেন ৫/- (পাঁচ) টাকা মাত্র। ১৯৬৪ সনের ১৮ই মার্চ হুযূর (রাঃ)- এর আদেশক্রমে এর হার ধার্য করা হয় কমপক্ষে ১০/- (দশ) টাকা মাত্র। পরবর্তীতে প্রয়েজনবোধে নিম্নোক্ত হার ২৪/- (চব্বিশ) টাকা মাত্র নির্ধারিত হয় আর আশা করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন এই তাহরীকে অংশ গ্রহণ করেন (হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর ১৯৫৬ সনের জলসা সালানার বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)। এরপরে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানী সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয় যেন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিনি রীতিমত মাসিক আয় করেন তিনি যেন তার মাসিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ এই খাতে সংবছর আদায় করার চেষ্টা করেন। **প্রত্যেক মুজাহিদ যেন নতুন বছরে ওয়াদা করার সময় পূর্ববর্তী বছরের ওয়াদার চেয়ে কিছু বাড়িয়ে ওয়াদা করেন কেননা, মু'মিনের পা সর্বদা আগে বেড়ে থাকে।** প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদকে ঐচ্ছিক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এবং এ চাঁদাগুলোর জন্যে এখন আর কোন নির্ধারিত হার থাকবে না। তবে তিনি চাচ্ছেন আবাল-বৃদ্ধ বণিতা ও নব দীক্ষিত নির্বিশেষে সবাই যেন এ তাহরীকে বিশেষ করে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। এ চাঁদার বকেয়াদারেরা ভোটার হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন না যেভাবে পূর্বে নিধারিত ছিলো যে, এসব চাঁদার তিন বছরের বকেয়াদার ভোটার হতে পারবেন না। **তবে হুযূর (আইঃ) এসব চাঁদার বকেয়াদারগণের নিকট থেকে নতুন ওয়াদা নিতে নিষেধ করেছেন** (সূত্র ঃ Rules and Regulations of Tahrik-e-Jadid Anjuman-e-Ahmadiyya, Revised -1998)

তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্য্যালয়

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ সনে নিজ পবিত্র কলমে তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জন্যে নিম্নোক্ত বিভাগ (ওকালত) গঠন করেনঃ ১) ওকালতে মাল, ২) ওকালতে দেওয়ান, ৩) ওকালতে তা'লীম, ৪) ওকালতে তেজারত, ৫)ওকালতে সানয়াৎ, ৬) ওকালতে কানুন, ৭) ওকালতে তবশীর, ৮) ওকালতে ইশাআত। পরে ওকালতের সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত ওকালতগুলোও যোগ করা হয়- ১) ওকালতে উলিয়া, ২) ওকালতে যিরাআত, ৩) দপ্তর আবাদী, ৪) সিগা আমানত ও ৫) অডিটর।

তাহরীকে জাদীদ স্থায়ী কুরবানীসমূহের অন্যতম ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহরীকে জাদীদকে স্থায়ী কুরবানীসমূহের তাহরীক হিসেবে ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন- "এ তাহরীকের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়। ঐ সময় আসছে যখন আমাদেরকে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। দুনিয়ার অর্থে আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সবার সাথে সংগ্রাম করতে হবে। কেননা, প্রত্যেক জাতিতে ও প্রত্যেক দেশে ভদ্রলোকও থাকে। আমার বলার উদ্দেশ্য এই, যেসব দেশে আমাদের পথ বন্ধ করার জন্যে প্রচেষ্টা চলেছে। তাই আমাদের সংগ্রাম শুধু হিন্দুস্থানে সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য দেশেও চলবে। আমাদের স্রষ্টা ও সত্যিকারের বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে হবে। যদি আহমদীয়ত কোন সমিতি হ'তো তাহলে আমরা ইহা বলে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারতাম যে, আমরা আমাদের প্রভাবের এলাকা সীমাবদ্ধ করে নেব আর যেখানে আহমদী রয়েছে তারা নীরবে বসে থাকবে। কিন্তু মুশ্‌কিল ইহা যে, আমাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যে বাণী তাঁর নিকট থেকে এসেছে উহাকে সমগ্র দুনিয়াতে পৌঁছে দিতে হবে আর আমাদের তা পৌঁছাতেই হবে। আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরী করি নি বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টি-কর্তা প্রণয়ন করেছেন" (আল্ ফযল ঃ ৩-১২-১৯৩৫)। পুনরায় তিনি বলেন,

"তোমাদের সামনে যে কুরবানীর সমুদ্র আসছে তাহরীকে জাদীদ তো তার এক গণ্ডুষ মাত্র। যে গণ্ডুষ দেখেই ভয় পায় সে সমুদ্রের কী দিবে।" (আল্ ফযলঃ ২-৭-১৯৩৬)।

তাহদীকে জাদীদের শান-শওকতপূর্ণ ভবিষ্যৎ

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখানো হয়- "একটি গভীর সমুদ্রের ন্যায় নদী যা সাপের মত এঁকে বেঁকে পূর্বদিকে যাচ্ছে পুনরায় দেখতে দেখতে পথ বদলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উল্টো বইতে শুরু করলো" (আল্ হাকাম ঃ ১৭-৪-১৯০)।

বস্তুত ইহা সেই মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের এক দৃশ্য যা ভবিষ্যতে শীঘ্র শীঘ্র তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। এর ফলে তাহরীকে জাদীদের পাঁচ হাজারী বাহিনীকে লাখে পৌঁছাতে হবে। আর পুনরায় পাশ্চাত্যের প্রতি দুনিয়ার যে দৃষ্টি তা ইসলামের নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থায় (New world order) রূপান্তরিত হবে। ইহা নিয়তির বিধান। ইহা হবেই হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একবার উদাত্ত কণ্ঠে বলেন- "যখন আমরা ইহা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, আমরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেব আর ইসলামের প্রতাপ ও এর মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্যে নিজেদের সব কিছুকে কুরবানী করবো তো ঐ তবলীগি পরিকল্পনার জন্যে আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা পূরণ করাও আমাদের জামাতেরই অবশ্যই কর্তব্য। সত্যি কথা বলতে কি সারা দুনিয়াতে সঠিকভাবে ইসলামের প্রচারের জন্যে আমাদের লক্ষ লক্ষ মুবাল্লিগ (প্রচারক) ও কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। যখন আমি রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকি তখন সমগ্র দুনিয়াতে তবলীগ বিস্তার দেয়ার জন্যে কখনও বলি আমাদের এত মুবাল্লিগ দরকার, কখনও বলি এত মুবাল্লিগ দরকার, আবার কখনও বলি এত মুবাল্লিগ দরকার। আবার কখনও বলি এত মুবাল্লিগ দ্বারা কাজ হবে না, এর চেয়েও বেশী মুবাল্লিগ প্রয়োজন হবে। এ পর্যন্ত যে, কখনও কখনও বিশ লাখ পর্যন্ত সংখ্যা হিসেব করে শুয়ে যাই। আমার এ সময়ের ধারণা যদি রেকর্ড করা যায়, তাহলে মনে হয় দুনিয়া এ ধারণা করবে যে সবচেয়ে বড় 'শেখ চিল্লী' (গল্পের গোয়ালা যে অনেক অনেক কল্পনা করে) আমিই। কিন্তু আমার নিজস্ব অনুমানে আমি এত আনন্দ পাই যে, সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আমি কখনও চিন্তা করি যে, পাঁচ হাজার মুবাল্লিগ যথেষ্ট হবে, পুনরায় চিন্তা করি যে, পাঁচ হাজারে কি হবে, দশ হাজারের প্রয়োজন। আবার মনে করি দশ হাজার কিছুই নয়। জাভায় এত মুবাল্লিগের দরকার, সুমাত্রায় এত মুবাল্লিগের দরকার, চীন ও জাপানে এত মুবাল্লিগ দরকার। পুনরায় প্রত্যেক দেশের জনগণের হিসাব করি আর বলি, এ মুবাল্লিগ খুবই কম। এর চেয়েও বেশী মুবাল্লিগ দরকার। এরূপে বিশ লাখ মুবাল্লিগের সংখ্যায় পৌঁছে যাই। নিজের এই আনন্দের মুহূর্তে আমি বিশ বিশ লাখ মুবাল্লিগের প্রস্তাব করি। দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমার এ অনুমান কল্পনার চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে না। কিন্তু খোদাতাআলার নিয়ম এই যে, কোন জিনিস যদি একবার সৃষ্টি হয়ে যায় উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত তা ধ্বংস হয় না। নিঃসন্দেহে আমাকে 'শেখ চিল্লী' বলুক কিন্তু আমি জানি যে, **আমার এ ধারণা খোদা কর্তৃক সৃষ্ট ময়দানে রেকর্ড হয়ে চলেছে আর ঐদিন বেশী দুরে নয় যেদিন আল্লাহ্‌তাআলা আমার ধারণাকে বাস্তবতার সঙ্গে পূর্ণ করা শুরু করবেন। আজ নয় তো কাল থেকে ষাট অথবা একশ' বছর পরে খোদাতাআলার কোন বান্দা এরূপ হবে, যে আমার এ রেকর্ডকে বাড়াবে যদি তার সৌভাগ্য হয় তো এক লাখ মুবাল্লিগ তৈরী করবে। পুনরায় আল্লাহ্‌তাআলা কোন এমন এক বান্দাকে দাঁড় করাবেন, যিনি যে মুবাল্লিগের সংখ্যাকে দু'লাখে পৌঁছাবেন। এভাবে পদক্ষেপ আগে আগে বেড়ে আল্লাহ্‌তাআলা ঐ সময়ও নিয়ে আসবেন যখন সমগ্র দুনিয়াতে আমাদের ২০ লাখ মুবাল্লিগ কাজ করতে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলার নিকট প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সময় নির্ধারিত থাকে। এর পুর্বে কোন জিনিসের আশা করা বোকামী হয়। আমার এ ধারণাও এখন রেকর্ডে সংরক্ষিত হয়েছে এবং ইহা যুগ থেকে মিটে যেতে পারে না। আজ নয় তো কাল এবং কাল নয় তো পরশু আমার এ ধারণা বাস্তবে রূপ লাভ করবে"** (আল্ ফযল ঃ ২৮-৮-১৯৫৮)। (চলবে)

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সহস্রাব্দের নব সিঞ্চনে ন্যাশনাল জলসা সালানা-২০০১

সারা বিশ্বের লোকজন বিশেষতঃ খ্রীষ্টান জগৎ তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে চাতক পাখির মত তাকিয়েছিল। তাদের ভাষ্যমতে গত ২০০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঈসা মসীহ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এ পৃথিবীতে পুনরাগমন করে জগদ্বাসীকে উদ্ধার করতঃ মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করবেন। সবচেয়ে দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, মুসলমানগণও এ বিশ্বাস কর্তৃক তাড়িত হয়েছেন। এখন তারা নিজেদের মুখ আড়ালে লুকিয়ে ভাবছেন, কেউ তাদেরকে দেখছেন না তো। আর আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কদিয়ানী (আঃ) একশত দশ বৎসর পূর্বেই ঘোষণা দেন যে, ঈসা মসীহ্ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি কুরআন হাদীস এবং ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণ করেন তাঁর দাবীর সত্যতা। এতদিন ধরে আল্লাহর নিয়ম কর্তৃক ঘোষিত আয়াতে করীমার সত্যতা প্রমাণ করে সারা জগৎ এ দাবীর বিরোধিতা করছিল। অপরদিকে সমস্ত পৃথিবীতে বসবাসকারী অসংখ্য মু'মিন বান্দা আবাবীল পাখির ন্যায় বর্ণ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে যোগদান করছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল- **"আজ হতে তৃতীয় শতাব্দী পার হবে না, যখন ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনে বিশ্বাসী কি মুসলিম কি ইহুদী কি নাসারা সকলেই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। এবং তখন শুধু একটাই ধর্ম হবে ইসলাম, আর একজন নেতা হবেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।"** একটি ইমারত নির্মাণে যেমন ভিত্তি প্রস্তুত হতে সময় লাগে ঠিক তেমনি আহ্মদীয়তের ভিত্তি নির্মিত হতে লেগেছে বিগত একশত বৎসর। এখন দেখা যাবে সেই ভিত্তির উপর কত দ্রুত ইমারত নির্মিত হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্তাআলার তকদীর তিনশত বৎসরে আহ্মদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের বিজয় নিশ্চিত-অনিবার্য। আমরা যদি আলস্য-শৈথিল্য প্রদর্শন করি তাহলে আল্লাহ্তাআলা এক নতুন জাতি সৃষ্টি করে দিবেন। আর যদি যুগ-খলীফার (আইঃ) নির্দেশে আমরা জান-মাল-সময়- সম্ভ্রম সব বিসর্জন দিয়ে ধর্মের সেবায় নিজেদেরকে মুজাহিদ হিসাবে পরিগণিত করতে পারি তাহলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রতিশ্রুত ইসলামের বিশ্ব বিজয় এসে যাবে। আর খ্রীষ্টানদের যে দাবী ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিন সম্বন্ধে আর এই খ্রীষ্টাব্দ গণনা নিয়ে তা-ও এক ভ্রান্ত ধারণা। এই সনের প্রবর্তক খ্রীষ্টানগণ নয়। এ আরেক ভিন্ন আলোচনার বিষয়-বস্তু। তবু, যেহেতু তাদের ধারণা ছিল ২০০০ সনের মধ্যে ঈসা (আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করবেন তাই এ দিনক্ষণকে ঠিক হিসাবে ধরলেও তাদের দাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এমনই এক সময়ে-কালের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে গত ৯,১০ও ১১ই ফেব্রুয়ারী -২০০১ সনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৭তম ন্যাশনাল সালানা জলসা। অপরদিকে হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত ফতোয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রায়ে দেশবাসী হয়েছে উদ্বেলিত (স্বার্থান্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ব্যতীত)। এমনই যুগ-সন্ধিক্ষণে আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের সমস্ত আলামতই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এবারকার জলসা সালানায় খাকসারকে গেষ্ট হাউজ সাব কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। জলসার পূর্বেই কয়েকবার ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাদেরকে নিয়ে জলসার প্রস্তুতিমূলক সভা করেন। হুযূর (আইঃ) সবসময়ই জলসা সালানায় তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে থাকেন। তাই আমাদের প্রস্তুতি ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত হুযূরের (আইঃ) প্রতিনিধি আসেন নি। তবে জলসায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও বিহারের প্রাদেশিক আমীর মোহতরম মাশরেক আলী মোল্লা সাহেব আসেন ৮ই ফেব্রুয়ারী। এছাড়াও গেষ্ট হাউজে আরো অবস্থান করেন মোবাল্লেগ ইমদাদুর রহমান ও বশীরুর রহমান সাহেব। পটুয়াখালীতে কর্মরত জুনিয়র মোবাল্লেগ সাহেব শামছুদ্দিন আহমদ মাসুমও গেষ্ট হাউসে থাকেন। তবলীগের জগতে জীবন্ত কিংবদন্তী মাশরেক আলী সাহেব তাঁর খাওয়া -দাওয়া, চলা ফেরা অতি সাধারণ। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্ট হবে যে, মানুষ এত সাধারণ হ'তে পারে! জলসাতে সবার জন্য যে রান্না হয়েছে তা-ই তিনি খেতেন। অন্যদিকে ১৯৯৯ সনের ৮ই অক্টোবর খুলনা মসজিদে বোমা হামলায় পা হারিয়েছেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেব। কাছ থেকে তাঁদের সেবা করতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁদের দোয়া এবং ভালবাসায় আমি বেঁচে থাকার উৎসাহ পাই। এবারকার জলসায় লোকদের ঠিকমত জায়গা দেয়া যায় নি। লোক সমাগম হয়েছে পূর্বের চাইতে বেশি। আর নতুন কর্মীদের অবস্থান ছিল লক্ষ্যণীয়। খোদাতাআলার অসীম ফযল ও রহমতে দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আমাদের প্রাণের মিলন মেলা জলসা সালানা-২০০১। ১৮৯১ সালে মাত্র ৭৫ জন পুণ্যাত্মা নিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে জলসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন খোদার পরম ফযলে আজ তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে গেছে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে যে দোয়া করে গিয়েছেন আমরা যদি সত্যিকারের দরদে দিলে জলসায় যোগদান করি তাহলে আমাদের জীবন হবে স্বার্থক, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া হবে পরিপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) জীবনের শেষ জলসার উপস্থিতি ছিল ২০০০ এর মত। আর এখন MTA-এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে দেশেই জলসা অনুষ্ঠিত হয় তা এক বিশ্ব-জলসায় পরিণত হয়। আমাদের ২০০১ সনের জলসায় কাদিয়ানের নাযেরে আলা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, যুক্ত রাজ্যের আমীর ইফতেখার আয়াজ সাহেব, অষ্ট্রেলিয়ার আমীর মাওলানা মাহমুদ আহ্মদ সাহেব ও নিউজিল্যান্ডের আমীর সাহেব সহ অনেকেই বাণী পাঠান। নানা বাধা-বিপত্তি ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাটিয়ে খোদাতাআলার হামদ ও সানার মাধ্যমে অশেষ ফযল ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করেছে এই জলসা সালানা। সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হতো তবলীগি সেমিনার। তাবলীগি আলোচনায় প্রশ্নোত্তর পর্ব হতো প্রাণবন্ত এবং ঈমানোদ্দীপক। জলসার পর দিন ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর সাহেব সহ আমরা যাই ধানসিঁড়ি রেস্তোঁরায়। মাহবুব ভাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে আপ্যায়ন করলেন। সেখান থেকে আমরা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাসায় গেলাম। ১৩ই ফেব্রুয়ারী আমীর সাহেব কোলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ভারতের বাংলা আহমদী পত্রিকা "আল্ বুশরা" এর বাংলাদেশ প্রতিনিধির দায়িত্বে দিয়ে গেছেন আমাকে। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও খোদাতাআলার কৃপাদৃষ্টি আমাকে সুনিশ্চিত করেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে। সময়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই জলসা জড়জগতের প্রতি এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দিয়েছে যে, তোমাদের যা করার ছিল ক'রে নিয়েছো। এখন তোমাদের করণীয় আর কিছুই নেই। আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলাম শনৈ: শনৈ: এগিয়ে চলছে অবিরত। ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব-বিজয় আসতে আর বেশি দিন নেই। আরশ থেকে খোদা পৃথিবীর তকদীর আহমদীয়তের মাঝে নিহিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

সপ্ত তারের সুর ধ্বনিতে প্রকম্পিত আকাশ
দেরী নেই আর হ'তে বেশি তজল্লীয়তের বিকাশ
আহমদীয়ত খোদার প্রিয় বিশ্ব-নবীর দাস
ইসলামের বিশ্ব-বিজয় আমাদের দৃপ্ত অভিলাষ।
খোদার সিংহ মসীহ মাওউদ মুহম্মদের দাস
সামনে তিনি (সঃ) পিছনে ঐশী সেনার বাস,
দোয়ারত দিবা-নিশি বিকশিত মুক্তাকাশ
জলসায় মিলিত হয়েছি সবে মিথ্যা করতে নাশ।
খোদা মোদের ভালবাসা-স্বর্গ অনির্বাণ
বিজয় মশাল মোদের হাতে জাগাব মহাশম্মান।

- মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবিব (জয়)

হোমিওপ্যাথি

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

ঔষধ নম্বর-৯

এগারিকাস মাস্কারিয়াস
AGARICUS MUSCARIUS

(Fly Fungus)

এগারিকাস ঔষধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো শরীরের কম্পন। অঙ্গ-প্রতঙ্গের দুর্বলতা আর মানসিক চাপের কারণে পেশী আর স্নায়ুসমূহ কাঁপতে আরম্ভ করে। হাত কাঁপে, স্নায়ু-কম্পন আরম্ভ হয় আর সারাটা দেহ কম্পন অনুভব করে।

একটিয়া রেসিমোসারও (সিমিফিউগা) উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হ'লো শরীরের কম্পন কিন্তু এ দু'টোতে তফাৎ বিদ্যমান। একটিয়ায় রোগী যেদিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে সে দিকটাতেই কম্পন অনুভূত হয় অথচ এগারিকাসে সমস্ত দেহটাই কাঁপে। এতে কম্পন ও খিচুনী দু'টোই দেখতে পাওয়া যায়। চোখও কাঁপে আর নড়তে থাকে, একস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। একবার এক যুবক ঠিক এই রোগেই আক্রান্ত ছিল। আমি তাকে এগারিকাস দিলাম। এতে তার এত উপকার হলো যে, সে দৈনন্দিন কাজকর্ম অনায়াসে করতে আরম্ভ করে, তা না হলে তার এই পীড়া কিন্তু বয়সের সাথে সাথে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

এগারিকাস-এ চোখের লক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জিনিষ একটির বদলে দু'টি করে দেখা যায়। চোখের সামনে যেন কালো কালো জিনিষ নাচছে বলে মনে হয়। চোখ ট্যারা, চোখ-জ্বলা, চুলকানী , চোখের ক্লান্তি হ'লো এর সাধারণ লক্ষণাবলী। এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দুষ্কর হয়ে থাকে,রোগী কিছু পড়তে গেলে সমস্যা দেখা দেয়। চোখের মণিগুলো ঘড়ির দোলকের মত নড়তে থাকে। হলুদাভ ঘন রসের মত চোখ থেকে বের হয় যার কারণে চোখের পাপড়ি আটকে যায়। রোগীর মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের পরিশ্রমে আর লেখাপড়ার কাজ করলে সে ক্লান্তি অনুভব করে। এ রোগে আক্রান্ত শিশুরা সাধারণতঃ জেদী, রগচটা আর স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। এদের সামান্য বকা-ঝকা করলে, এর দুঃখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই লক্ষণটি এস্‌কুলাসে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। কোন শিশুর মাঝে যদি এসব লক্ষণ বিদ্যমান থাকে আর চোখের ডানে বামে নড়াচড়ার বিশেষ লক্ষণটি যদি না-ও থাকে তাহলে এগারিকাস অবশ্যই দেয়া উচিত। কিছু সংখ্যক শিশুর মস্তিষ্কের দুর্বলতা প্রাথমিক কাল থেকেই বিদ্যমান থাকে। সকাল বেলায় এই অবস্থার বেশী অবনতি ঘটে। তখন তাদের কোন কথা বল্‌লে বুঝতেই পারে না। তাদের অলস আর অনুভূতিহীন বলে মনে হয়, চেতনাহীন অনুভূতি আর ক্লান্ত বলে মনে হয়। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে এদের কষ্টও কমতে থাকে। সন্ধা বেলায় কিংবা রাতের কোন এক প্রহরে এরা একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠে। সব কথা বুঝতে পারেন, এদের হাসি খুশী দেখায় এসব শিশুদেরকে এস্‌কুলাস প্রদান করুন। রোগের এই লক্ষণাদি যদি এগারিকাসেও বিদ্যমান কিন্তু রোগ বৃদ্ধি বা হ্রাসের নির্দিষ্ট সময়সূচী এস্‌কুলাসকে এগারিকাস থেকে পৃথক করে দেয়।

এগারিকাসের স্নায়বিক দুর্বলতা কখনো কখনো শ্রবণ শক্তি লোপের কারণ হয়। ঠান্ডা বাতাস লেগে কানে ব্যথা, লালাভ রঙ ধারণ আর জ্বলন প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। কখনো কখনো তীব্র শীতের সময়ে বাইরে থেকে হঠাৎ গরম কক্ষে প্রবেশ করলে হাতে পায়ে ভীষণ চুলকানি আরম্ভ হয় আর এগুলো লালাভ বর্ণ আর ফোলা ফোলা দেখা যায়। এই পীড়ার নাম chill-blain। এমন প্রত্যেক রোগ যাতে রক্ত বিশেষ এক অঙ্গে একত্রিত হয় যার ফলশ্রুতিতে খিচুনী, অস্থিরতা,লালাভ বর্ণ ধারণ ব্যথা আর চুলকানি হয় এসব ক্ষেত্রে এগারিকাস বড়ই উপকারী। কয়েক ধরনের এলার্জিতেও এই ধরনের লক্ষণাদি দেখা দেয়। যেমন, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার ফলে হাত-পা ফোলা, লালাভ রঙ ধারণ, অস্বস্তি এগুলোতে ভীষণ ব্যথা আর চুলকানি হয়। রোগীর এগারিকাসের অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকলে এই ঔষধ অব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এলার্জি রোধক অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হবে না। এক দু'বার সেবনই আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে কষ্ট দূর হয়ে যায়। কখনো আবার এর স্থলে ফসফরাস কার্যকর সাব্যস্ত হয়। অনেক শিশুর ক্ষেত্রে কথা বলার সময় কথা আটকে যায়। তাদের অনেক চেষ্টা করে কথা বলতে হয়। বার বার কথাকে পুনরাবৃত্তি করে আর কথা আটকে যায়। এ রোগের প্রকৃত কারণ হ'লো ভীতি। তাই এর মানসিক চিকিৎসাও আবশ্যক। সাধারণতঃ ষ্টেমোনিয়াম গভীর স্নায়বিক ভীতি থেকে উৎপন্ন রোগসমূহ দূর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তোত্‌লামি আর কথা আটকে যাবার ক্ষেত্রে এর উল্লেখযোগ্য কোন কার্যকারিতা দেখা যায় নি। তাই রোগের প্রকৃত কারণকে মনে রেখে ঐষধ প্রয়োগ করা উচিত। **এগারিকাসও** তোত্‌লামির ক্ষেত্রে উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে।

এগারিকাসে রোগ-স্থানান্তরের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কখনো কখনো শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় কোন দুর্ঘটনা বা দুঃসংবাদ বা মানসিক আঘাত বা চাপের কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায় আর মস্তিষ্কে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে এগারিকাস উপকারী। যদি মায়ের বুকে দুধ স্বল্প পরিমাণ হয় অথবা শুকিয়ে যায় এরই মাঝে মস্তিষ্কে বিকার দেখা দেয় তবে এক্ষেত্রে এগারিকাসও সম্ভাব্য একটি ঔষধ। সাধারণতঃ দুধ শুকিয়ে গেলে পালসেটিলা বেশী কার্যকর হয়ে থাকে

তবে এটি কেবল সেই ক্ষেত্রেই কাজ করে যেখানে সংশ্লিষ্ট মায়ের পালসেটিলার অন্যান্য লক্ষণ বর্তমান থাকে। তা না হলে দুধ প্রবহমান করার জন্য আরও ঔষধ বিদ্যমান। যেমন- একোনাইট, এগানাস ক্যাসটাস, এসাফিটীডা, ব্রাইয়োনিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব, কস্টিকম, ক্যামোমিলা, ল্যাক ডিফ্লোরেটম, ফসফরিক এসিড, ফাইটোলাক্কা, সেকিলিকর, সাইলেসিয়া ও ইউরটিকা।

এগারিকাসে 'এস্‌কুলাসে'-র মতই আক্রমণের প্রবণতা পাওয়া যায় আর 'চাপ' নীচের দিকে হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যথা একই স্থানে কেন্দ্রীভূত অথবা দুর্বল হয় না। কেননা, স্নায়ুতন্ত্রে এমন গতি বিদ্যমান থাকে যার কারণে ব্যথা কখনো একদিকে আবার কখনো অন্যদিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে এগারিকাস অধিক উপকারী।

এগারিকাসের রোগীর পেটে অনেক গ্যাস হয়।

নাড়ীভূড়ীর স্বাভাবিক নড়াচড়ার মাঝে দুর্বলতা দেখা দিলে আর পেটে অস্বাভাবিকভাবে বেশী গ্যাস দেখা দিলে এগারিকাস উপকারী। **নাক্স ভমিকা**-ও নাড়ীভূড়ীর স্বাভাবিক নড়াচড়াকে পুনর্বহাল করার ক্ষেত্রে অতি কার্যকর একটি ঔষধ। এর জন্য বেশী করে লক্ষণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। পেটের **স্থায়ী** আর **অস্থায়ী উভয় প্রকার রোগে নাক্স ভমিকা** উত্তমরূপে কার্যকর। এটা সালফারের মত খুব গভীরও নয় আবার একোনাইটের মত ক্ষণস্থায়ীও নয় বরং এটা হ'লো মধ্যম অবস্থানের একটি ঔষধ।

এগারিকাসের রোগী সাধারণতঃ নিজের চিন্তা-ভাবনার জগতে আনমনা হয়ে থাকে। এর বিশেষ একটি লক্ষণ হলো এতে আক্রান্ত রোগীর মুখমন্ডলের স্নায়ু আর পেশী নাচতে থাকে। একই লক্ষণ নাড়ীভুড়ীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যদি নাড়ীভুড়ীতে স্পন্দন অনুভূত হয় কিন্তু এই নড়াচড়া নীচের দিকে না হয়ে থাকে তাহলে এগারিকাসই এর ঔষধ হবে।

এগারিকাসে কাল্পনিক সব দৃশ্যাবলীও রোগী দেখে থাকে। মহিলাদের গর্ভাশয়ে বিষাক্ত পদার্থ একত্রিত হ'লে তারা সাধারণতঃ কাল্পনিক দৃশ্যাবলী দেখা আরম্ভ করে। শিশুর জন্মলাভের পর যদি গর্ভাশয় ভালভাবে পরিষ্কার না হয় তাহলেও মস্তিষ্কে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ পালসেটিলা কার্যকরী সাব্যস্ত হয়।

গর্ভাশয়ে প্রদাহের ফলে যদি জ্বর হয় তাহলে সালফার আর পাইরেজিনাম ২০০ শক্তিতে মিলিত আকারে ব্যবহার করা উচিত। যদি এ ধরণের রোগীণি কাল্পনিক সব দৃশ্য দেখা আরম্ভ করে আর তার বুকের দুধও যদি শুকিয়ে যায় তাহলে এগারিকাস কার্যকর সাব্যস্ত হবে। প্রদাহ নিবারণের কাজে সালফার ও পাইরোজিনামের সাথে সাইলেসিয়া, ক্যালি মিওর, ফেরমফস ও ক্যালি ফস সবগুলো ৬x শক্তিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করাটাও উত্তম এক ব্যবস্থা!

এগারিকাসে একজিমাও দেখতে পাওয়া যায়। এই একজিমার লক্ষণ হলো হলুদ বর্ণের তরল রসযুক্ত ফোস্‌কা যা স্নায়ুবিক আঁশের সঙ্গে ত্বকের উপর প্রকাশিত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্নায়ুবিক দুর্বলতাকে একজিমায় রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে। এমন আরও কয়েকটি রোগে স্নায়ুবিক নালীর সাথে ফোস্‌কা পড়তে দেখা যায় যা সাধারণতঃ Herpes -এর লক্ষণ হয়ে থাকে। এর অনেক ধরন আছে। কিন্তু এগারিকাস Herpes-এর ঔষধ নয় আর এর একজিমা আর ফোস্‌কার সাথে Herpes-এর কোন সম্পর্ক নেই।

হারপিস (Herpes) বড়ই কষ্টদায়ক একটি ব্যাধি। স্নায়ুবিক অন্যান্য রোগ-ব্যাধির চাইতে ভিন্নভাবে এই রোগটাকে বুঝতে হবে। আর যথাসময়ে এর সঠিক চিকিৎসা করা আবশ্যক, তা না হলে, অন্যান্য মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। আমি আগে এর জন্য সাইলেসিয়া, ক্যালি ফস আর ক্যালি মিওর প্রয়োগ করতাম যার ফলে এক পর্যায় পর্যন্ত ভাল কাজ করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে সাব্যস্ত হলো 'হারপিস' রোগের সর্বোত্তম চিকিৎসা-পত্র হলো সেই ব্যবস্থাপত্র যা আমি সাপ-বিচ্ছুর কামরে প্রয়োগ করে থাকি। মরহুম জনাব আফতাব আহমদ খান সাহেব একবার সাংঘাতিক হারপিসে আক্রান্ত হন। তাঁকে আমি আর্নিকা ২০০, লিডম ২০০ আর আর্সেনিক ২০০ প্রদান করি। অসাধারণ দ্রুততার সাথে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ধরা-বাঁধা কোন চিকিৎসাপত্র আমার জানা নেই যা প্রতি ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে। কেননা, এই রোগ নিজের রূপ পরিবর্তন করে বিভিন্ন আকারে দেখা দেয়।

এগারিকাসের রোগী নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। হাতে ধরা জিনিস বার বার পড়ে যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশুদের হাত থেকে বাসন-পত্র পড়ে ভেঙ্গে যায়, কোন জিনিস ধরতে চাইলে মুঠি শক্ত করে ধরতে পারে না আঙ্গুলগুলো যেন নিজে নিজেই খুলে যায়। পেশীগুলোতে প্রচন্ড ব্যথা হয়-এর সাথে খিচুনীও থাকে। হাত পা যেন কুঁকড়ে যায়।

এগারিকাস-এ রোগ খাদ্যাহারের পর, খোলা হিমেল বাতাসে আর শীতকালে বৃদ্ধি লাভ করে। ঘুমালেও অবস্থার উন্নতি হয় না। দিনের বেলাতেও বিমর্ষভাব আচ্ছন্ন করে রাখে। জ্বালাকর চুলকানী হয়।

প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ এবসেনথিনম, কফিয়া, ক্যামফর
সেব্য পটেন্সী ঃ সাধারণতঃ ৩০ থেকে ২০০

অনুবাদ– আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাসহীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

যুগের চাহিদা

যদি বলি আল্লাহ্ কথা বলেন, কিছু লোক রেগে যাবে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিও দেবে; হয়ত টেনে-টুনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার আত্ম-তৃপ্তির স্বাদও পেতে থাকবে। এমনকি জাগতিক দ্বন্দ্বের ফলা-ফলের চেয়ে ঐশী দ্বন্দ্বের ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ জেনেও এরা হত্যায় আনন্দ পায়, তাজা রক্ত বুকে মুখে মাখিয়ে আনন্দের হোলি খেলায় মেতে ওঠে। অথচ এই উভয়ের মধ্যে না আছে কোন জাগতিক দ্বন্দ্ব না আছে কোন লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ তবে এমন অবস্থা ওদের মনের মধ্যে কেন কুন্ডলী পাকায়? সচেতন ব্যক্তিদের চিন্তার খোরাকও বটে! পাঠকদের হয়ত কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সেই নরবলীর যুগে, 'জোর যার মুল্লুক তার' পরিশেষের যুগে।

আমরা মুসলমান। পবিত্র কুরআন আমাদের ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বলে আমরা দাবী করি। এর মধ্যে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে সবই নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বাণী বলে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন মুসলমানের দ্বি-মত নেই, নেই আল্লাহ্র কালাম সম্বলিত এই গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির এতটুকু অভাব। তাই তো মুসলমানেরা প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ভোর বেলায় একে চুমু খেয়ে নামায়, সুললিত কণ্ঠে পড়ে, আবার চুমু খেয়ে রক্ষিত তাকের উপর আলতোভাবে সংরক্ষণের অভ্যাস করে।

প্রশ্ন হচ্ছেঃ যুগ যুগ ধরে পঠিত বাক্যগুলি কতখানি প্রতিবিম্বিত হয়েছে মুসলমানদের অন্তরে? ব্যক্তি, পারিবারিক সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনেও আল্লাহ্র বাণীর মাহাত্ম্যই বা কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? উত্তরে আসবে, না, হয় নি তেমন। এসেছে শুধু বর্বরোচিত আচরণ, উন্নতি লাভ করেছে ধর্ষণের প্রক্রিয়া, প্রতিযোগিতা চলছে হত্যাকান্ডের যা নবীকুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালের যুগকেও ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহ্র বাণী, নষ্ট যুগে, শ্রেষ্ঠ নবীর মুখ দিয়ে শুধু মাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রেরণ করা হয়েছিল মিথ্যা ছেড়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য।

প্রশ্ন হচ্ছে ঃ আমরা আল্লাহ্র প্রিয় মুসলমানেরা সত্যের উপর কতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি এবং কতখানি কল্যাণের ফসল ঘরে তুলেছি এই চৌদ্দশ' বছরের অধিক সময় ধরে? যে কোন কাজ করলে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। সে ভাল হোক আর মন্দই হোক। আল্লাহ্র বাণী পবিত্র। তার ফল অবশ্যই পবিত্র। পবিত্র বাণীর চাষ করে যে ফসল মুসলমানেরা ঘরে তুলেছে তা কি পবিত্র? এ-কথা বললে কি অত্যুক্তি হবে যে, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ঐশী নির্দেশে মানব কুলের মঙ্গলের জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আজ সেই বিদ্যালয়ের নামধারী ছাত্রকুল ঐ ছাত্রদলের ন্যায় নয় কি? যারা সুসজ্জিত পোষাকে সন্নিবেশিত হয়ে চাকচিক্য মোড়কে বই আবৃত করে নিয়মিত পড়ুয়া সাজে আর ফলাফল বয়ে আনে অনূর্ধ্ব তৃতীয় শ্রেণীর মাপের? বাস্তব জীবনের বর্ণাঢ্য সাফল্য আনতে ব্যর্থ হয়ে ভক্তি হয় সর্বহারা দলে। বনে যায় অপকর্মের নায়ক? এ হেন পুত্রের গর্বিত পিতা হ'লে আনন্দের ঢেউ জাগে পিতার অন্তরে।

জীবন-পথের একমাত্র পাথেয় হিসাবে যে পবিত্র বস্তু মহান আল্লাহ্তাআলা আমাদের হাতে অর্পণ করেছেন তার প্রথমেই উল্লেখ রয়েছে; **যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফিহ্** অর্থাৎ এই কিতাবে যা কিছু উল্লেখ আছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, বাণীগুলি বোধগম্যে এনে বাস্তব জীবনের প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে, না শুধু সুর করে শব্দগুলির প্রকৃত উচ্চারণের মধ্যে ডুবে থাকলেই বাণীর মর্মার্থ বোধগম্যে এসে যাবে?

আমরা অনারবী। যদিও আরবী সকল ভাষার মধ্যে সহজবোধ্য ভাষা তথাপি কোন ভাষা না শিখে তার বৈশিষ্ট্যাবলী সহজে আয়ত্তে আনা কঠিনই বটে। মনীষীরা বলে গেছেন, অধ্যয়নং তপঃ। আমাদের গ্রন্থদাতা মহান আল্লাহ্তাআলা ঘোষণাও করেছেনঃ **কুরআনাল ফজরে ইন্না কুরআনাল ফজরে কানা মাশহুদা** অর্থাৎ ফজরে কুরআন পাঠ কর নিশ্চয়ই প্রত্যুষে কুরআন পাঠ তোমাদেরকে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দিতে পারে। তা হলে একথা আমরা সহজেই বলতে পারি যে, চৌদ্দশ' বছরের অধিক সময় ধরে কুরআন পাঠ করেও কল্যাণের উচ্চশিখরে আরোহণের পরিবর্তে আমরা নিপতিত হয়েছি অতি নিকৃষ্টতম স্থানে। পাঠক লক্ষ্য করুন, যেখানে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নির্দেশ দিচ্ছেন প্রত্যুষে কুরআন পাঠ করতে এ জন্য যে, আমরা মানুষেরা যাতে উচ্চতর মর্যাদায় পৌছাতে পারি। ভক্তির সাথে পাঠও করা হচ্ছে অথচ ফল দাঁড়াচ্ছে উচ্চতর মর্যাদার পরিবর্তে নিকৃষ্টতম অবস্থান তা হলে কি আল্লাহ্তাআলা তাঁর ঘোষিত ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন? নাউযুবিল্লাহ্ এমনটি হতেই পারে না; বরং আমরাই উচ্চতম মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি।

পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা হয় আদম (আঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে। এর আগেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। কারণ মানুষ না থাকলে সভ্যতার দিকে আহ্বান করার প্রয়োজনই পড়ে না। তখনকার যুগে তাদের এমনই অবস্থা ছিল যে, ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। জীবন ধারার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ অনুভূতিতে নাড়া দিতে থাকে। আস্তে আস্তে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ ও অহংকার প্রভৃতি পাপের সেন্টরগুলি অংকুরিত হতে থাকে। ফলে মহান স্রষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কল্যাণ প্রতিষ্ঠা-কল্পে তাদেরই মধ্য হতে উন্নীত করলেন এক মহান ব্যক্তিত্বকে, যাঁর নাম হযরত আদম (আঃ)। এরই ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী ও রসুল শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। পাক কালামে এরশাদ হয়েছে ঃ **লাকাদ বায়াসনা ফি কুল্লী উম্মাতি রসূলান** অর্থাৎ- আমরা প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে রসূল উত্থিত করেছি। এভাবে মানুষের জ্ঞান বিকাশের ধারা যতই উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে নবী রসূলের আগমনের ধারাও শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর হয়েছে।

ল্যাংটা মানুষ পদব্রজ থেকে আজ রকেটে চড়ে চন্দ্রে অবতরণ করেছে। একগ্রহ থেকে অন্য গ্রহে অনুসন্ধানের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বহুমুখী বৈজ্ঞানিক উন্নতির জোয়ারে মানুষ আজ আনন্দ সলিলে ভাসছে। লোকে বলে আমেরিকায় যাচ্ছি। একদিন হয়তো বলবে, মঙ্গল গ্রহে নাতিকে দেখতে যাচ্ছি। এর চেয়েও অনেক অনেক উন্নতি করবে মানুষ, যা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ছোট বেলায় শুনেছি, দাদী-নানীরা বলেছেন, কেয়ামতের আর দেরী নেই, শুনছি মাথার উপর দিয়ে কি নাকি উড়বে। আজ মাথার উপর দিয়ে ঠিকই উড়ে যাচ্ছে দেশ-দেশান্তরে কিন্তু কেয়ামত এখনও আসে নি!

মানুষের জ্ঞান প্রথম অবস্থায় থাকে সীমিত। শুষ্ক বীজ যেমন তাপ, মাটি, পানি আর বায়ুর সংমিশ্রণে এলে অংকুরিত হয়; তেমনি জ্ঞানও তার সংশ্লিষ্ট বিকাশস্থলের সংযোজনে বিকশিত হয়। তাই তো আল্লাহ্ আমাদের শিখিয়েছেন ঃ **রব্বি জিদনী ইলমান** অর্থাৎ- হে প্রভু! আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দাও। ধৈর্য বান্দার মস্তবড় গুণ। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ **ওস্তাঈনু বিস্‌বিস্‌সবরি ওয়াস্‌সলাহ্, অর্থাৎ কল্যাণের জন্য ধৈর্যের সাথে আমার কাছে** সাহায্য চাও। **ইন্নাল্লাহা মাআস্ সবেরীন।** অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। সকল প্রকার পাপ মার্জনার মোক্ষম সময় হলো নামায। তাহাজ্জুদ নামায হলো উত্তম হাতিয়ার। তাই তো তিনি উত্তম আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ আমি তোমাদের অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট। শত অপরাধ করেও অনুশোচনা ও বিনয়ের সাথে দোয়া চাইলে তা রব্বুল আলামীন মাফ করে দেন। পাক কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ **ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা** অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তিনি বার বার দয়ার দৃষ্টিদানকারী।

আজকে পৃথিবীতে মুসলমানদের অবস্থা জাতি হিসাবে সবচেয়ে অধঃস্তন জাতি বললে বেশী বলা হবে না। অথচ এই জাতির নেতাকে শুধু বিশ্ব মানবের নেতা নয়, বিশ্বে আগত সকল ঐশী নেতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে ঐশী সনদও প্রদান করা হয়েছে। এরই আলোকে এক শ্রেণীর উলামা তাঁকে 'সব শেষ নবী' আখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষের পবিত্র বিশ্বাসে ঘূণ ধরিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করে আসছে। যার প্রতিফলস্বরূপ আজ আমরা পৃথিবীতে

অধঃপতিত জাতি হিসাবে পরিগণিত হতে চলেছি, অথচ শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করা উচিত ছিল না কি? অভিনয়ের ক্ষেত্রে জাগতিক উচ্চতর ডিগ্রী লাভের প্রয়াশ আর আমাদের হাতে অর্পিত পবিত্র গ্রন্থের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী এই অবস্থার জন্য দায়ী।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)) নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ নবী ও শরীয়তধারী শ্রেষ্ঠ নবী। তার শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথিবীতে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অনুসৃত হয়ে কোন না কোন নবী -রসূলকে এই পৃথিবীতে আগমন করতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলার ঐশী-বাণী বিবর্জিত কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখা একেবারেই অসম্ভব।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা তো প্রথমে গোত্রে গোত্রে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। এই ধারা বন্ধ হয়েছে বিশ্বনবীর আবির্ভাবের পর। এখন শুধু বিশ্বে যাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরই অনুসারীদের মধ্য হতে হেদায়াতকারী প্রেরণ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ কেবল মাত্র আমার সিলসিলার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন ঘটবে এবং অন্য সকল সিলসিলার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি (আঃ) উম্মতি নবীর মর্যাদা নিয়ে অবতীর্ণ হবেন এবং হারানো খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি ক্রুশও ধ্বংস করবেন। খেলাফত অর্থ স্থলাভিষিক্ত ব্যবস্থাপনা। প্রিয় পাঠক, অর্থ ভান্ডার ও প্রতিনিধিত্বকারী ছাড়া যেমন কোন জাগতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না; তেমনি বায়তুল মালও খলীফা ছাড়া কোন ঐশী সিলসিলাহ্‌ চলতে পারে না। আল্লাহ্‌তাআলা ওয়াদা করেছেন ঃ **ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আমিলুস্ সলিহাতি লা ইয়াস্‌তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদ্-কামাসতাখ্‌লাফাল্লা যীনা মিন কাবলিহিম।**

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন (সূরাতুন্ নূর আয়াত ঃ ৫৬)।

আমরা জানি, হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যা করে খোলাফায়ে রাশেদীনকে চিরতরে বিলুপ্ত করা হয়। এমন কি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আদরের নাতী নয়নের মণিদ্বয়কে শহীদ করে চিরতরে ইসলামের নাম পর্যন্ত পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার সকল প্রকার কৌশল কার্যকরী করা হয়। কিন্তু সকল কৌশলের উপর আল্লাহ্‌র কৌশলই উত্তম। আল্লাহ্‌ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। তাই তো তিনি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হবার পরই তারই প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আঃ)-কে ঐশী-নির্দেশনা দিয়ে পৃথিবীতে এই অধঃপতিত অসহায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত জাতিকে সুসংহত ও সকল মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য সঠিক সময়ে প্রেরণ করেছেন। নবুওয়তের শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ ও শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে দাবী করার যোগ্যতা কি করে অর্জিত হবে যদি মহান আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ওয়াদা সময় মত কার্যকরী না করেন? তাই তো তিনি তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সিলসিলার মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আঃ)-কে প্রেরণ করে অহোরাত্র ঐশী-নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করে, বায়তুল মাল ও হারানো খিলাফত সুদৃঢ় করে তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা পাক কালামে ঘোষণা করেছেন ঃ **হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহি ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকূন।**

অর্থাৎ- তিনি তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মুশরিকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন (সূরা আস্ সাফ্‌ফ ঃ ১০)

মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের ১৪০০ বছর পূর্বে ঘোষিত বিজয় দান উপলক্ষ্যে মুসলমানেরা কতখানি অগ্রসর হয়েছেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় পৃথিবীতে খ্রীষ্টান জাতির সংখ্যাই তালিকার শীর্ষে শোভা পাচ্ছে। ইতিহাস পাঠে এ-ও জানা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দির প্রথম থেকেই বহু শিক্ষিত ও নামি-দামী মুসলিম ধর্মবিদ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং অন্যদের অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য সারা বিশ্বে অত্যন্ত জোরে-শোরে প্রচারণা চালিয়েছেন। এইভাবে চলতে থাকলে ইসলামের বিজয় কোথায় গিয়ে পৌছাত তা সহজেই অনুমেয়। তথাকথিত উলামা সমাজে আল্লাহ্‌তাআলার অঙ্গীকারের মূল্যায়ণই বা কীভাবে হতো? পবিত্র কালামে পাকে এসেছে ঃ **ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লে শায়ইন কাদীর'**। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরাতুল বাকারা ঃ ১১০)।

হ্যা, তিনি তাঁর ক্ষমতা তাঁর বিকাশের মধ্য দিয়েই দেখিয়ে থাকেন। তা বিরুদ্ধবাদীরা যতই রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হউক না কেন।

আজ এই ২০০০ সাল নাগাদ মাত্র ১১১ বছরের আহমদী সিলসিলা ১৭০টি দেশে 'মিশন' তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রত্যেক দেশে প্রায় প্রতিটি জামাতে নিজস্ব ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে অহোরাত্র ইসলাম ধর্মের প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে গত ১৯৯৯-২০০০ইং সালে সমগ্র বিশ্বে মোট ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৮ হাজার ২ শত ৫৬ জন আহমদীয়া সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে মহান আল্লাহ্‌তাআলার গুণকীর্তন করছেন। এসবই সেই মহা শক্তিধর পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তাআলার ঐশী ওয়াদার ফল।

প্রিয় পাঠক, সত্য সত্যই তাকে আবৃত করে মিথ্যায় পরিণত করা যায় না। আসুন, সেই মহান শক্তিধর আল্লাহ্‌তাআলার বিকশিত সত্যকে আমাদের হস্তে অর্পিত পবিত্র ঐশী-বাণীর আলোকে বুঝবার ও গ্রহণ করবার জন্য তাঁরই দরবারে পবিত্র জ্ঞান দানের জন্য দোয়া চাই- কারণ, তিনিই তো আমাদের একমাত্র অভিভাবক এবং দোয়া কবুলকারী। তিনি তো আমাদের অতি নিকটেই। তাঁর অর্পিত সত্যকে গ্রহণ করে অঙ্গীকার পূরণে সাড়া দেই। তিনি তো বলেছেন ঃ **"ওয়া আউফু বিআহদি উফি বি আহদিকুম ওয়া ইয়ায়া ফারহাবুন"** অর্থাৎ- এবং তোমরা আমার (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করিব, এবং আমাকেই ভয় কর (সূরাতুল বাকারা ঃ ৪১)।

ওয়া আমিনু বিমা আন্‌যালতু মুসাদ্দিকাল্লিমা মায়াকুম ওয়ালা তাকূনূ আওওয়ালা কাফিরিম বিহী ওয়া লা তাশ্‌তারু বি আয়াতি সামানান কালীলা।

অর্থাৎ- এবং তোমরা আমার উপর ঈমান আন যাহা আমি নাযিল করিয়াছি, যাহা তস্‌দীক করে উহার যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং তোমরা ইহার সর্ব প্রথম অস্বীকারকারী হইও না, এবং আমার আয়াতসমূহকে অল্পমূল্যে বিক্রী করিও না, ... (সূরা বাকারা ঃ ৪২)।

আসুন, আমরা আল্লাহ্‌র আহ্‌বানে জ্ঞানের সাথে সাড়া দিই। পরম দয়ালু আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য গ্রহণ করার তৌফীক দান করুন, আমীন! সুম্মা আমীন।

- আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন মোল্লা

প্রাইভেট সেক্রেটারী
টু হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)

মোকাররম ও মোহতারাম
আমীর সাহেব, ইউ, এস, এ

আপনার পত্র No. M.M.A /১০৮৭ হস্তগত হয়েছে। হুযূর (আইঃ) জাভেদ মতীনের সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন, "তার পিছু নিন। এই খবীস যেখানে যেখানে যায় সেখানে সেখানে তার জামাত হতে ইখরাজের ঘোষণা দিন। শুধু বয়কটেরই ঘোষণা নয়, ইখরাজের ঘোষণাও দিবেন।" হুযূরের নির্দেশ পালনের জন্য প্রেরিত হলো।

ওয়াস্‌সালাম

স্বাক্ষর ঃ **মুনীর আহমদ জাভেদ**
প্রাইভেট সেক্রেটারী

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 17th Issue

March 15, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

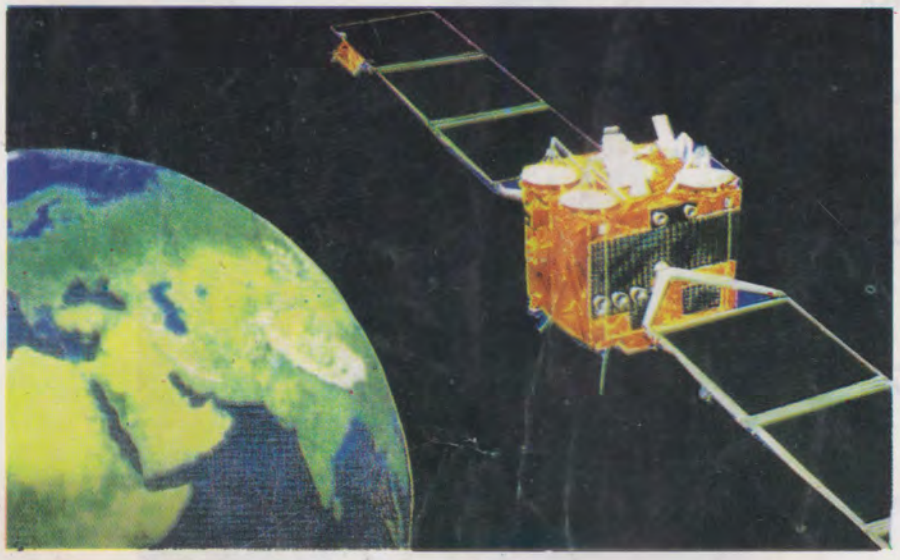

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272